উৎসর্গ

শ্রী অভীককুমার সরকারকে

১

ঘণ্টা পড়তেই সবাই চোখ বুজলো। তপতী। তপতীর এগারো বছরের মেয়ে এষা। সুবিনয় ঠিক পেছনের রোয়ে। সেখানে সেও চোখ বুজেছে। ডান হাতের থার্ড রোয়ে রবি। চোখ বুজে পদ্মাসন করে বসলো। এই জিনিসটা এখনো রপ্ত হল না। মেরুদণ্ড সোজা করে মাথাটা সিধে করে ফেলল রবি। তারপর দু'খানা হাতের পাতা বুকের সঙ্গে লাগিয়ে একদম নিষ্কম্প শিলা হয়ে গেল।

পুরানো আমলের বাড়ি। দোতলার এই হলঘরে এখন অন্তত শ'-খানেক লোক ধ্যানস্থ। ময়দান-ঘেঁষা এ সমাধি-ভবনে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয় আধ ঘণ্টা ধ্যান হয়। এ নির্জন রাস্তাটা খানিকক্ষণের জন্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে। নয়ত স্রেফ অফিসপাড়া। একটা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর, নার্সিং হোম, আর ট্র্যাফিক আইল্যাণ্ড। এই হল গিয়ে এ-রাস্তার দেখবার জিনিস। আর কিছু বড় বড় বাড়ি।

রবিবার সকালে সমাজের লোকজন রাস্তাটাকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে জীবন্ত করে তোলে। সেদিন বেলা ন'টা থেকে এগারোটা হলঘরে ওঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা হয়। বড় আশ্রমের কেউ এসে ওঁর কথা বলেন। বড় সুন্দর বলেন। শুনতে শুনতে রবির চোখে এক একদিন জল এসে যায়। সে একদম নতুন। তবু তার মন ওঁর জীবনের কথায় একদম জড়িয়ে যায়।

ধ্যান প্রথম শেখায় তপতী। রবি তখন ওসব একদম জানতো না। তা কয়েক মাস আগের কথা হবে। এখন রবি অনেক জানে। শুধু পদ্মা-সনে বসাটা রপ্ত হচ্ছে না। সুবিনয়কে রবি চেনে। চেহারায় চেনে। রবিকে আজও সুবিনয় চেনে না। দু'জনের কারও কথা হয় নি।

রবিবার সকালে ওঁর জীবনীগ্রন্থ দেওয়া হয় লাইব্রেরী থেকে। সেদিন বই বদলাবার দিন। দু'খানা বই নেওয়া যায়। অনেকেই বই নেয়। ওঁর দর্শন—ওঁর জীবন নিয়ে সব আলোচনা। সেদিনটা রবির মনে হয়, অন্তত আজকাল হচ্ছে—আমরা বুঝি সবার জন্যে সবাই।

রবি চোখ বুজে ভাবতে চাইল—তাব মাথার ওপরের ঢাকনা খুলে গেছে। সেখান থেকে কয়লার উনুনের ধোঁয়ার মতো কালো অন্ধকার গলগল করে উঠে এসে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর ঢুকছে আলো। নক্ষত্র-লোক থেকে পাঠানো আলো। নিজের বোজানো চোখ দুটো এখন কোনো সুগন্ধী ফুলের আধবোজা পাপড়ি হয়ে চোখের মণি দুটোর ওপর পড়ে আছে। আর দুই ভ্রূর মাঝখানে অদৃশ্য আজ্ঞাচক্র স্থির হয়ে দাঁড়ানো।

আধ ঘণ্টার ধ্যান একসময় ফুরিয়ে এলো। যে যার আসন নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ধূপধুনোর ভেতর ওঁর বিশাল ছবিখানা স্থির হয়ে দেওয়াল ধরে আছে। রবি দেখলো—গুরুদেব ছবি থেকে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন। স্থির, করুণামাখানো চোখ। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তোলা ছবি। জন্মদিনে এই ছবিখানাই ছাপা হয় কাগজে।

রবি বারবার তাকিয়ে গুরুদেবের দৃষ্টির বাইরে যেতে পারল না। এখন তপতী আর সুবিনয় একসঙ্গে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। দু'জনের থমথমে স্নিগ্ধ মুখ। পাশে এষা। এগারো ছাড়িয়েছে সবে। বাবা মায়ের মতো ওর চোখেও চশমা। রবি এষার মুখে আগেকার তপতীর মুখচ্ছবি দেখতে পেল। কিন্তু এখন এগিয়ে গিয়ে সে-কথা বলা যাবে না। তপতী এখন রবিকে চিনবে না। এষাও চিনবে না। সেরকমই শেখানো মায়ের। ও অল্পবয়স থেকেই মায়ের সঙ্গে বসে ধ্যান করে। সেই পাঁচ ছ'বছর বয়স থেকেই। তপতী বলেছিল, জানো রবি—এষার আজকাল ভিসন হয়। অনেক কিছু দেখতে পায় চোখ বুজলে।

রবি অবাক হয়েছিল খুব। তাই নাকি! কি দেখতে পাও এষা?

—অনেক জিনিস। নানা রঙের। খুব লাজুক মুখেই বলেছিল এষা। এগারো, সাড়ে এগারো বছরের মেয়ে। একটা শ্যামল, স্নিগ্ধ লাবণ্য সারা মুখে। লাজুকও বটে। ওর অনুভবের কথা কীভাবে বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

তপতী বলেছিল, তিন চারখানা খাতা বোঝাই করে লিখে রেখেছে। দেখো এক সময় রবি।

ধ্যানের পর চোখমুখ ভরাট হয়ে যায়। মন অচঞ্চল হয়। সবাইকে ভালো বোধ হয়। এই কিছুকালের ধ্যানের অভ্যাসে রবি নিজেই লক্ষ্য করেছে—তার মনঃসংযোগ অনেক বেড়ে গেছে। আগে কোনোদিন গুরুদেবের জীবনী সে পড়ে নি। ঈশ্বরের কথা সে বিশেষ কিছু জানে না। সে রবিরঞ্জন গুহ। বয়স উনচল্লিশ। একজন স্ত্রীর স্বামী। কলকাতায় ভাড়াটে গৃহস্থ। বড় ছেলে এইট্-এ উঠলো। আরেকটি মেয়ে আছে। হাতে-খড়ি হয়েছে তার গত বছর। এখন ছড়ার বই ছিঁড়ে ছিঁড়ে বারান্দায় মেলে রাখে। অফিস থেকে রবি ফিরলে পাতাগুলো এনে এনে দেখায়। নতুন ফোন করতে শিখেছে। একবার ফোন ধরলে আর ছাড়ে না। ছুটির দিনে বেড়াতে বেরোলে একদম ড্রাইভারের পাশে গিয়ে সামনের সীটে বসবে। সেই তুলনায় বড় ছেলে বুবু অনেক গম্ভীর। ওর মা সুজাতার পাশে পেছনের সীটে এমনভাবে বসবে—যেন ভাইবোন। সে আর খোকাটি নয়।

সাহেবপাড়া ঘেঁষা অল্প আলোর এই বিখ্যাত রাস্তায় দাঁড়িয়ে রবির মনে হল—এ আমি কি করছি? মনস্থির করতে ধ্যানে বসছি আজ তিন মাস হয়ে গেল। অথচ সমাধিভবন থেকে বেরিয়ে তপতীকে দেখবার জন্যে আমি এখন ওদের গাড়ির তিনখানা গাড়ির পেছনে বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে আছি।

তপতী একবারও তাকালো না। চোখে সেই সরু ফ্রেমের চশমা। চোখ দুটো বড় বড়। স্থির। পাশে ধুতি-পাঞ্জাবি সুবিনয় মুখার্জি দিব্যি

আদর্শ স্বামী হয়ে দাঁড়ানো। এষা গিয়ে সামনের সীটে বসলো। সেও একবারের জন্যে রবিকে ফিরে দেখলো না। অথচ ধ্যানের আগে যে যার আসন নেওয়ার সময় এষার সঙ্গে রবির দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল। এষার সে চোখে হাসি ছিল না। বিরক্তি ছিল না। স্রেফ একটা অচেনা পর্দা ঝুলছিল ওর দৃষ্টির সামনে।

সুবিনয়ের গাড়ি স্টার্ট নিয়ে প্ল্যানেটরিয়ামের দিকে চলে গেল।

একে একে বাকী গাড়িগুলোও চলে গেল।

গাড়িতে বসে চন্দ্রাকে বলল, ক্লাবে চলো।

২

এষা লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছিল। নিউ আলিপুরে ও ব্লকে এ বাড়িটা অন্য বাড়িগুলোর সঙ্গে একাকার হয়ে আছে। একতলায় গ্যারাজ। এবং ভাড়াটে। দোতলাতেও ভাড়াটে। সিঁড়ি দিয়ে সুবিনয় উঠছিল সবার শেষে। মাঝখানে তপতী। তেতলায় উঠতে মোট সাত খানা ছবি পড়ল গুরুদেবের। দেওয়ালে ঝোলানো। ল্যাণ্ডিংয়ে বড় ছবিখানা।

তেতলায় উঠে তপতী প্রথমেই ওদের বাড়ির ধ্যানের আসনের সামনে গুরুদেবের ছবিতে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিল দু'দিকে। তারপর মাথা মেঝেতে রেখে মনে মনে তিনবার বলল, আমায় অচঞ্চল কর। অচঞ্চল —অচঞ্চল।

আসলে সুবিনয়দের বাড়িটা চারতলা। তেতলার বড় লবির লাগোয়া তিনখানা ঘর। একটা বড় ঝুলবারান্দা। সেখান থেকে অনায়াসে পুরো নিউ আলিপুর, কালীঘাট, রেল স্টেশনের ওপাশের বনস্পতি কারখানা—সব দেখা যায়। এই বারান্দা থেকেই একটা সরু সিঁড়ি উঠে

গেছে চারতলায়। সেখানে ছাদের সঙ্গে একটা কাচের ঘর। ওরা নিজে-দের মধ্যে বলবার সময় বলে কাচঘর। বিলেত থেকে ফেরার তিন বছরের মধ্যে এ বাড়ি। তখনই দু'জন শখ করে ও-ঘরটা বানিয়ে-ছিল।

এষা বসবার ঘরের লম্বা চৌকিতে উপুড় হয়ে শুয়ে কি আঁকতে বসে গেছে। তপতী চা নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে সুবিনয় খুব মন দিয়ে সকা-লের বাসি কাগজের সম্পাদকীয় পড়ছে।

চা নামিয়ে রেখে তপতী বলল, বিস্কুট নেবে?

না। দরকার নেই। বোস। তোমার আজ কি হয়েছে?

তপতী ভালো করে সুবিনয়ের দিকে তাকালো। ঠোঁটের ওপর সেই ছেলেমানুষীর তিলটা জায়গামতোই আছে। ষোল বছর আগে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসের বারান্দায় এপ্রিলের প্রথম রোদ এই মুখে পড়বার সময় তিলটাই সবার আগে চোখে পড়েছিল তপতীর। দুপুরের কোর্টে বেরোবার সময় এক হাতে কোট, অন্য হাতে ব্রিফ নিয়ে সিঁড়িতে নামবার মুখে সুবিনয় ওপরে দাঁড়ানো তপতীকে একবার ঘুরে দেখে। তখন ওই তিল সবার আগে চোখে পড়বে তার।

—কিছুই হয় নি তো।

—না হলেই ভালো। একটা মৃদু হাসি সুবিনয়ের মুখে এসে মিলিয়ে গেল। বাইফোকাল চশমাটা নাকে আরও চেপে নিয়ে সুবিনয় কাগজ পড়তে লাগল।

কাপের চা শেষ হতে তপতী বলল, চল না, আমরা কোথাও ঘুরে আসি। কত তো রেস্ট হাউস হয়েছে আজকাল। রূপনারায়ণের ওপর একটা বাংলো দেখেছিলাম সেবারে—

—কোথাও গেলে তোমার এখন ভালো লাগবে না। তুমি খুব চঞ্চল হয়ে পড়েছো। এবারে হাতের কাগজখানা নামিয়ে সুবিনয় তপতীর চোখে তাকালো। কোথাও আঁচ-না-লাগা পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের শরীর।

বিলেত থেকে ফেরার সময় এই মেয়েটিই পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছিল। সঙ্গে আরও অনেক কাগজপত্র। বোধহয় একতাড়া চিঠিও।

—আজ শেষ রাতে তুমি ধ্যানের আসন থেকে উঠে গেলে আচমকা। আমি চোখ বুজে ছিলাম। তবু টের পেলাম। এষাও বুঝতে পেরেছে—আমার মনস্থির হচ্ছিল না। যা ভাবতে চাই—কিছুতেই তা মনে আসছিল না। আজ্ঞাচক্র অস্থির ছিল। ডান চোখের পাতা কাঁপছিল। তাই ভাবলুম—কি হবে ধ্যানে বসে -

তাই বলে ঠাণ্ডায় ছাদে দাঁড়িয়েছিলে ?

ভোর হচ্ছিল দেখছিলাম—

ভোরের তো তখন অনেক বাকী। এখানে একটু থামলো স্থবিনয়। চোখের চশমাটা খুলে মুখের ভাপ দিয়ে দুটো কাচই পরিষ্কার করল। তারপর সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সারাদিন কোর্টে থাকি। সেটা আমার পেশা। তুমিও দেশে ফিরে কোনো চাকরি নিলে নিশ্চয় এতদিনে অফিস বস্‌ হয়ে উঠতে। কিন্তু চাকরির বাইরে আমাদের বাকী জীবন—ধর্মের জীবন। সততার জীবন।

এখানে স্থবিনয় সরাসরি তাকাতেই তপতী কেঁপে গেল।

আমি কিছু বলতে চাই না। আমাদের কি অস্থির হলে চলে ?

চারিদিকে স্থন্দর জীবনের ছবি। দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে যা দেখা যাচ্ছিল তাও একটি স্বচ্ছল ছবি। দোতলা তেতলা বাড়িগুলোর স্থন্দর স্থন্দর ঘরে উজ্জল নিওন। একেবারে কাছের বাড়িটার দেওয়ালে স্থন্দর একখানা ক্যালেণ্ডার ঝোলানো। ওরা বেশী রাত অবধি আলো জ্বালিয়ে গল্প করে।

এষা ছুটে এসে স্থবিনয়কে বলল, বাবা আজ চোখ বুজে আমি এই রাস্তাটা দেখতে পেয়েছি। দ্যাখো—

রাস্তাটা আঁকবার চেষ্টা করছে এষা। দু'ধারে যেন কালো বর্ডারের গাঢ় সবুজ রাস্তা। তার একধারে সোনালি রঙের ফুলে বোঝাই গাছপালা।

উল্টোদিকে একটা কালো কুকুর দাঁড়িয়ে। তার চোখ দুটো আগুনের গোলা।

সুবিনয় মন দিয়ে দেখছিল।

কুকুরটাকে দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম বাবা—

মনস্থির কর মা। তোমার আজ্ঞাচক্র তোমাকে পথ দেখাবে—

আমি চোখ খুলি নি কিন্তু। গুরুদেবের কথা তখন ভাবলুম। খুব মন দিয়ে—

তখনো তপতীর ডান চোখের পাতা কাঁপছিল। অস্থিরতা ঢাকতে খোলা জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। এষা আবার নিজের মনে ছবি আঁকতে ফিরে যেতেই সুবিনয় উঠে দাঁড়ালো। তারপর খুব আস্তে ক'পা এগিয়ে তপতীর কাঁধে আলগোছে হাত রাখল।

তপতী চমকালো না। ও বাড়ির জানলার আলো তখন ওর মুখে চিক-চিক করছে। বিশেষ করে বড় বড় ফোঁটার চোখের জলের ওপর আলো এমন চলকায়।

সুবিনয় কাছে এসে পড়ায় তপতী বাঁ হাতে তাড়াতাড়ি মুখটা মুছতে গেল। পুরোপুরি পারল না। তপতী বুঝতে পারল, এ কান্না এখন সে আটকাতে পারবে না। কিন্তু এটাও বুঝতে পারল না—এ কান্না কার জন্যে।

সুবিনয় খুব আস্তে বলল, গুরুদেব করুণার কথা বলেছেন। আবার মায়ার কথাও বলেছেন। থাক না। চোখ দুটোকে একটু কাঁদতে দাও। তাহলে তোমার মনস্থির হবে।

৩

রবিকে আজ বেড টি দিল না সুজাতা। তার বদলে পাকা টমেটোর ফালি সাজিয়ে একটা প্লেট ধরল সামনে।

মুসুম্বি নেই?

ফুরিয়ে গেছে।

ভোরবেলা ফ্রিজের ঠাণ্ডা মুসুম্বির রস স্টমাকের পক্ষে খুব উপকারী। আরও উপকার হয়—যদি রাতের বেলা ওগুলো না খাও। সুজাতা বলতে বলতে রান্নাঘরে গেল।

বুবুর স্কুল সকাল সকাল। রবি নিজে উঠে বিলায়েতের তিলক কামোদ চাপিয়ে দিল। রেকর্ড প্লেয়ারটার ভেতর আবার আরশোলা ঢুকছে। নয়ত আওয়াজ এ রকম কেন হবে। কেমন ফ্যাসফেসে।

আবার শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়েই রবি একটা লিস্ট করল। বকেয়া কাজের লিস্ট। করতে করতে বুঝলো—এতগুলো কাজ সে কোনো-দিন আর শেষ করতে পারবে না। যেমন—

বুবুর লিভিং সায়ান্সের একজন ভালো টিচার যোগাড় করা দরকার।

গাড়ির গিয়ারের পাঞ্জা স্লিপ করছে। সেটা অ্যাডজাস্ট না করালে নয়। থার্ড গিয়ার দিলে পড়ে যায়।

সুজাতার পিল খাওয়া একদম বন্ধ করা দরকার। গালে মেচেতার দাগ পড়ছে।

মেয়েটার হাড় মোটা করার একটা টনিক একান্ত প্রয়োজন।

ইনসিওরেন্সগুলো অল্প বয়সে করা হয়েছিল। সেগুলো এখন কোন্ অবস্থায় আছে? ইত্যাদি। ইত্যাদি।

বিলায়েত ভালোই বাজাচ্ছিল। সেতার একটি ভালো যন্ত্র। মনের

ভেতরে অভিমান, রাগ ইত্যাদি যেভাবে ঢেউ খেলে—তারগুলো ঠিক সেই টোনে বাজে। হঠাৎ চোখে পড়ল তাকে। সেখানে তপতীর দেওয়া বইগুলো টাল করে সাজানো। সবই ধর্মগ্রন্থ।

আঠারো বছর পরে তপতী প্রথম দেখা হওয়ার পর ওই আটখানা বই পড়তে দিয়েছে তাকে। বালি কাগজ দিয়ে মলাট দেওয়া। ভেতরে গুরুদেবের ছবি। একখানি বইয়ের নাম—কে এই বাবা ? পাতাগুলো ওলটালো রবি।

গুরুদেবের জন্মতারিখ থেকে সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের সাল তারিখ সাজানো। একদম দেহরক্ষা পর্যন্ত। সেই কবে ১৮৯০ সাল থেকে একদম ১৯৫২ পর্যন্ত। আশ্রমের বিবরণ তপতী দিয়েছিল তাকে। বলেছিল, তুমি যদি সেখানে যাও—তোমার মন একদম ভরে যাবে। সব অস্থিরতা কেটে যাবে। ওঁর শ্বেত পাথরের সমাধির ওপর গুলমোহর ফুল ঝরে পড়ে সারাদিন। আগে থেকে জানিয়ে গেলে সকাল সন্ধ্যে প্রসাদ পাবে। সমাধির ভেতরে অর্জুন কাঠের বাক্সে ওঁকে শুইয়ে রাখা আছে।

একটি অধ্যায়ের নাম—মহাব্রহ্মের আলো। গুরুদেব এই আলোর সন্ধান পান ১৯৩৭ সালে। সাধনার সবচেয়ে বড় কথা—মনস্থির করা। একাগ্র হওয়া। নির্লোভ জীবনযাপন। বাহুল্য বর্জন।

রবি নিজের মনেই হেসে উঠলো। এখন সে কি কি বর্জন করতে পারে ? সিগারেট ? ড্রিংকস্ ? আলস্য ? তিনটেই সে ছাড়তে চায়। কিন্তু পারছে কোথায় ?

তপতী বইগুলো দেওয়ার সময় বলেছিল, তুমি এখন জীবনে প্রতিষ্ঠিত। ইচ্ছে করলে সৎ জীবনযাপন করতে পার। তারপর হেসে বলেছিল, স্ত্রীরা এসব বই দু'চক্ষে দেখতে পারে না। ভাবে, তাদের রোজগেরে স্বামী শেষে না সাধু হয়ে যায়। আয় করা ভুলে গিয়ে যদি দাড়ি রাখে।

না। না। সুজাতা তেমন নয়। সুজাতার কোনো লোভ নেই।

ও কথা বোলো না। মেয়েমানুষের লোভ থাকবেই। আমি তো বীথি আর সনৎকে এ-বই দিতে গিয়েছিলাম। বীথি সনতের হাতে বইগুলো একদম দেয় নি। বলে কি, তোর সবটাতেই বাড়াবাড়ি দিদি। থেমে গম্ভীর হয়ে বলেছিল তপতী—কি বলব তোমায় রবি। বীথি আর সে বীথি নেই। আমার নিজের ছোট বোন। দুঃখের কথা—নিজের হাতে সনতকে হুইস্কি ঢেলে দেয়। থিয়েটার রিহার্সালের নামে সনতের হাতে সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে তুলে দেয়। আবার বলে—তাতে নাকি সনতের মন ভালো থাকবে। ওদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে তোমার দেখা হয় নাকি?

রবি মিথ্যে মিথ্যে মাথা নেড়ে বলেছিল, না। একদম না।

দেখা হলে বোলো না যেন, আমার সঙ্গে আবার এতদিন পরে তোমার দেখা হয়েছে।

রবি বলেছিল, পাগল! মনে মনে বলেছিল—তপতী। তোমার জীবন যদি ধর্মেরই হয়—তবে এত লুকোচুরি কিসের জন্যে? কেনই বা দেড় যুগ পরে ছদ্মনামে চিঠি লিখে আবার যোগাযোগ করলে? এত সাবধানতা কিসের জন্যে? ভাগ্যিস হাতের লেখা চিনতাম বলে বুঝতে পেরেছিলাম—এ তোমারই চিঠি। নয়ত আর দেখাই হত না।

তোমার এবারকার চিঠি সুজাতাকে পড়িয়েছি।

প্রথমবারের চিঠিও সেই কোন্‌কালে পড়িয়েছিলাম। সে যাক্‌গিয়ে। সে অনেককালের কথা। সেবারে সুজাতার সদ্য বিয়ে হয়েছে। তোমার চিঠির তাড়া খোলা ড্রয়ারে পড়ে থাকত। এক একদিন পড়ত—আর গম্ভীর হয়ে যেত।

এবার কিন্তু তা হয় নি। এবারকার চিঠিও দেখতেই চায় নি। দেখাতে—ঠোঁট টিপে হেসেছে শুধু। একবার জানতে চেয়েছিল—সুবিনয়বাবুর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিল না?

রবি বলেছিল, না তো।

তিনি বাড়িতে ছিলেন?

না। কোন্ কোম্পানির বৈঠকে গেছেন। সেখানে শেয়ার আছে। তাই—

রবি ধুত্তোর বলে উঠে বসল। রেকর্ডখানা নামালো। তারপর তাক থেকে তপতীর দেওয়া গুরুদেবের জীবনীগুলো একটু নাড়াচাড়া করতে লাগল। সঙ্গে খানিকটা রাম ঢেলে নিল গ্লাসে। নিটা। একটা লম্বা ঢোঁকে সবটা শেষ করে বুঝলো শরীরটা এখুনি চনমনে হয়ে উঠবে।

নাকের ওপর চশমাটা চেপে ধরে জীবনী পড়তে বেশ ভালোই লাগছিল রবির। গুরুদেব সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু ধর্মের জীবনের জন্যে সে বিয়েতে কোনো ফল ফলে নি। তিনি সতীসাধ্বীই থেকে যান। তারপর একনাগাড়ে সাতাশ বছর সাধনভজনের জীবন। তারপরই মহাব্রহ্মের আলো।

রবির মনে পড়ল—সে কবে প্রথম গুহাবাসী সাধু দেখেছিল। কোথায় দেখেছিল? আরাবল্লীতে। অফিসের কাজে দেড় মাস রাজস্থানে ছিল একবার। তখন আরাবল্লীর এক পাহাড়-ঘেঁষা ছোট শহরে যেতে হয়েছিল। সেই শহরের শেষ থেকে পাহাড়ের শুরু। কী একটা কুণ্ডতে নাইতে গিয়েছিল। বিকেলবেলা। সাধু বালকরা কুণ্ডের জলে উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ে ভল্ট দিচ্ছিল। হাজার হোক বালক তো। পাহাড়ী ছাগল চরে বেড়াচ্ছিল। পথ এক প্যাঁচে পাহাড়কে ঘিরে উঠতে গিয়ে একটা শূন্য আকাশের ভেতর হারিয়ে গেছে। সারি সারি হনুমান বসে। ছোলা কিংবা খাবারের আশায়।

এমন সময় একজন দু'জন করে সাধু কমণ্ডলু ভরে কুণ্ডের জল নিয়ে পাহাড়ে উঠে যেতে লাগল। মুখে কথা নেই। একজনের হাতে খোলা গীতা। কোন্ একটা শ্লোক পড়তে পড়তে সাধুজী সারারাতের জন্যে আরাবল্লীর গুহায় চলে যাচ্ছেন। সারি দিয়ে ওরা পাহাড়ে উঠছেন। মাথার ওপর বিকেলের আকাশ। ওরা নাকি দিনের বেলায় শহরে নামেন। সন্ধ্যায় গুহায় ফেরেন। কেউ ভিক্ষা করেন না। পাহাড়ী পথে

চুপ করে বসে থাকেন। যার ইচ্ছে দেয়। সেই বিকেলটা রবির কাছে ভারতের ইতিহাসের একটি বিকেল। কিংবা জীবনেরও বিকেল। কোথায় কত লোক কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভেবে ভেবে সারা হচ্ছে। ঠিক তখন আরাবল্লীর গুহায় এক একজন মানুষ চুপ করে আসন করে বসে সন্ধ্যার আকাশ দেখেন। এর নাম ধর্ম, না ধ্যান ? কিংবা আত্মস্থ হওয়ার চেষ্টা ? রবি নিজেও চুপ করে দেখেছে—পৃথিবী কথা বলে। সে-ভাষা খুব চুপ করে শুনতে হয়।

সুজাতা এক প্লেট মাছভাজা এগিয়ে দিল। খেয়ে নিয়ে দাড়িটা কামাও তো। যা ব্যথা দিয়েছো না কাল!

কোথায় লাগলো ?

চিবুক তুলে ধরলো সুজাতা। এবারে ভালো করে তাকালো রবি। তার বিয়ে করা বউ দেখতে তো মন্দ নয়! মুখে বলল, সেভিং সেটটা দাও তো। খুব লেগেছে ?

লাগবে না ? আর কি সব বলছিলে। ঘুমের ভেতর জড়িয়ে জড়িয়ে।

কি বলেছি ?

সব মনে নেই। তপু তপু করছিলে। তার চেয়ে দিনের বেলা এখন গিয়ে দেখা করে এসো না! সুবিনয় বাবু নিশ্চয় বেরিয়ে গিয়েছেন এতক্ষণে।

ভুল শুনেছো।

খিলখিল করে হেসে উঠলো সুজাতা। সাবধানে কামাও। গাল কেটে যাবে নইলে—

৪

বেল টিপতেই দরজা খুলে দিল বীথি। ওমা! দেখেছো। রবিদা যে—কতদিন পরে ? মনে পড়ল তাহলে ?

কোনো কথা না বলে রবি বীথির সুন্দর নাকটা আদর করে একটু টিপে দিল। সনৎ এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ ভরতি হাসি।

এই তোমাদের নতুন বাড়ি। ভারী সুন্দর বানিয়েছো।

বীথি ঘুরিয়ে দেখাতে যাচ্ছিল। সনৎ বলল, আরে, আগে বসতে দাও দাদাকে।

বসার ঘরখানিই একটা ছোটখাটো বাড়ি বলা যায়। একদম হলঘর। জানলার পাশেই বাগান। সন্ধ্যার জোরালো আলোয় বাড়িটা আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। সনৎ বড় করে গ্লাসে ঢেলে দিয়ে রবির দিকে তাকালো।

জল ? না, সোডা ?

জল দাও। আজ রুগী দেখার ব্যাপার নেই ?

শনিবার সন্ধ্যেবেলা আমরা কাজ রাখি না কোনো।

বীথিও বলল, অপারেশন থাকলে সকালে করি।

দু'জনে বেশ জমেছো। একজন রুগী দেখছো। আরেকজন অপারেশন। এর ভেতর আমি এসে জুটি ঠিক যেন সনতের ভায়রাভাই।

হতে তো পারতেন রবিদা।

একটুর জন্যে ফসকে গেল। বলেই সনৎ হাসতে লাগলো।

সে দিনগুলো মনে পড়ে তোমাদের ?

খুব। বলল সনৎ একা। কিন্তু তিনজনেরই একসঙ্গে মনে পড়ছিল। বীথি সবে ডাক্তারীতে ভরতি হয়েছে। সনৎ ডিমনেস্ট্রেটর। তপতী বিলেত যাবে যাবে করছে। রবির সবে টায়ারের সেলসম্যান হব হব

অবস্থা।

ঠিক সেই সময়। মনে পড়ল রবির। মুখে বলল, কতকাল আগে বল তো? তা প্রায় পনেরো ষোলো বছর আগের কথা। আর চার বছর হলেই বলা যাবে—বিশ সাল পহলে—

একসঙ্গে তিনজনই হো হো করে হেসে উঠলো।

তোমার দিদির খবর কি?

এখন দেখা হলে আপনার ভালো লাগবে না।

তবু তো দেখতে ইচ্ছে যায় বীথি—

একদম ভালো না দাদা। আরেকটা দিই?

সনৎকে নিরস্ত করে রবি বলল, দেখা আর হোলই না। সেই দমদম থেকে প্লেন। তারপর আর দেখাই হয় নি।

দেখা হলে এখন আর ভালো লাগবে না রবিদা। সে দিদি আর নেই।

সনৎ হাসতে হাসতে বলল, আমার শ্বশুর এখন শিব। শালা নারদ! শাশুড়ী মন্দির নিয়ে আছেন। আর বড় শালীর তো ধর্মের জীবন যাচ্ছে!

বীথি বাধা দিয়ে উঠলো। ওভাবে বোলো না। যে যেভাবে শান্তি পায় —তাকে সে ভাবে পেতে দাও।

এত শান্তির কি হয়েছে বল তো। চারদিকে শান্তি। শান্তি! আমি তো জানি—খাটবো খাবো। ঘুমোবো বেড়াবো। বেশী হলে দান করব। কম থাকলে আবার খাটবো।

তোমাদের দিদির কী হয়েছে? ভদ্রলোক শুনেছি লিগ্যাল প্র্যাকটি-শনার।

ঠিকই শুনেছেন দাদা। তবে দু'জনই এখন ধর্মের লাইনে।

বীথি সনৎকে থামিয়ে বলল, দিদি সুবিনয়দা দু'জনেই একসঙ্গে ধ্যানে বসেন। অতটুকু মেয়েটাও বেশ ধ্যান করে। কী সব দেখতে পায়—চোখ বুজলে। ওদের দেখলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। তারপর থেমে

রবির দিকে তাকিয়ে বলল, অমন ঢকঢক করে খাচ্ছেন কেন? আপনার না প্যাচ হয়েছিল বুকে ? তুমিই বা অতটা করে দিচ্ছ কেন সনৎ ?

আহা ! দাদা কি ছেলেমানুষ? নিজের ভালোমন্দ বোঝার বয়স এখন হয়েছে—

ঠোঁট মুছলো হাতের উলটো দিক দিয়ে। তারপর রবি বলল, তোমার এই উদ্বেগ, রামের চেয়েও ইণ্টারেস্টিং। তুমি কি জানো—তোমার দিদি বিলেতে থাকতে আমার অসুখের খবর পেয়ে পোস্টাল অর্ডার পাঠিয়েছিল পাউণ্ডে !

সেই পাউণ্ড ভাঙিয়ে আপনি মদ খেয়েছিলেন ?

একখানা নভেল কিনে তোমায় উপহার দিতে গিয়েছিলাম হস্টেলে। তখন গন্ধ পেয়ে খুব বকেছিলে। ভীষণ আইডিয়ালিস্ট ছিলে। আসলে বল তো আমার তখন কী অবস্থা ?

সনৎ একটা মজার ঘটনা উপভোগের ভঙ্গিতে বলল, আপনিই বলুন দাদা।

কাঠ বেকার। চাকরি হতে হতে হচ্ছে না। সেলস্‌ম্যান হলে তোমার দিদির সঙ্গে বিয়ে হবে না। আমারই যেন তখন অরক্ষণীয়া অবস্থা। ভালোবাসার সবচেয়ে বিচ্ছিরি জায়গার নাম—অপেক্ষা। কণ্ডিশন। এটা হলে তবে ওটা হবে। যাকে আমরা বলি—শর্ত। কী ইন্‌সাল্টিং !

তার মানে আপনাদের কোনো ভালোবাসাই ছিল না।

এখন হয়তো তা স্বীকার করতে পারি। তখন গর্বে আটকাতো। সে দিন বলতে পারি নি।

এজন্যে আমার দিদিকে দূষবেন না রবিদা। আপনারই দোষ। আপনি জোর করেন নি কেন সেদিন ?

কী করে করব। তোমার দিদি তো তখন সাগরপারে। আমার পকেটে ট্রাম বাস ভাড়াই থাকতো না। এখন জানি—প্রেম কী জিনিস—

সনৎ হাসতে হাসতে বলল, কী জিনিস বলুন তো দাদা। আমি একটু

শিখে নেব।

এই আর কি—দেখা হওয়ার ইচ্ছে। তখন আব একজনেব আরেক-জনকে মানুষ বলেই মনে হয় না। কোথাও হেঁটে গেলে মনে হত সেখানে ফুল ফুটে উঠছে—

এ আপনাদেব ছেলেদের মাথার ভুল। এজন্যে আমরা দায়ী নই।

কেউ দায়ী নয় বীথি। এ রকম অনেকেরই হয়। হওয়াটাই স্বাভাবিক। এখন প্রেম বলতে কী জিনিস বোঝেন ববিদা ?

আমি কী পবীক্ষা দিচ্ছি সনৎ ?

সনৎ দেখল, রবিরঞ্জনের চোখ জোড়া লালচে। টকটকে ফরসা কপাল থেকে গাঢ কালো রঙের চুলের ঢালের শুরু। প্রথম যৌবনের কঠিন কাঠামোর ওপর বয়স হওয়ার প্রথম দিককার কিছু মাংস।

আমি কোনো পরীক্ষা দিতে আসি নি বীথি। আমি জানি না কেন এসেছি। কেন আসি কিছুদিন অন্তর ? হয়ত তোমার দিদিকে দেখতে ইচ্ছে করে। জানি এত দিন পরে আমাদের দু'জনের কারো মনেই কোনো স্মৃতি নেই আর। আমরা অনেক দিন হল দু'রকমের দু'জন মানুষ হয়ে গেছি। কিছুই মিলবে না আজ। সেই সময়কেও কান ধরে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তপুকে স্রেফ একজন রমণী ছাড়া কিছুই আব মনে হয় না আমার। এটাই বোধহয় নর্মাল। আমাদের বিয়ে হলে ও আমাব চোখে আরও অর্ডিনারি হয়ে যেত।

যত নষ্টের গোড়া আমারই বাবা। তিনি আমাদের জন্যে সব করেছেন। ভালোবাসেন। কিন্তু তাঁর জন্যেই সব এমন হয়ে গেল আমাদের এই সংসারে।

সে শিবকে নিয়ে এত টানাটানি কেন আজ !

ঠাট্টা নয় সনৎ। আমার তো বাবা। আমি জানি।

বড় বসবার ঘরে আলো কিছু মৃদু। ভেতরের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল —একটা চওড়া সিঁড়ি বিশাল ল্যাণ্ডিং অবধি ঠেলে উঠেছে।

সনৎ এবারই প্রথম গম্ভীরভাবে কথা বলতে লাগল। দিদির সঙ্গে রবিদার বিয়ে হলেও তো এসব ঘটতে পারতো। দিদি তো ন্যাড়ামুণ্ডি হয়ে দীক্ষা নিয়ে ফেলতে পারতো।

আমার দিদিটা চিরকালই গণ্ডগোলে মানুষ। এই দেখুন না রবিদা— এষাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়িতে পড়াচ্ছে। কেন? না, অতক্ষণ স্কুলে থাকলে মাথা ঘোরে। খিদে পায়। ভাবুন তো। নিজে কিন্তু স্কুল-কলেজে পড়েই এম. এ., পি এইচ. ডি. হয়েছিল।

বেশী পড়লে মেয়েদের মাথাটা গোলমাল হয়ে যায়।

খবর্দার সনৎ। ফিউডালদের মতো কথা বলবে না বলে দিলাম।

ফিউডালরাই মেয়েদের সবচে ভালো বুঝতো। লুট করে আনতো। কাজ ফুরোলে ফেলে দিত।

সে রকম জীবন তো খুব ভালো লাগে। চেষ্টা করে গ্যাখো না। তারপর আচমকাই রবির দিকে তাকিয়ে বীথি বলল, কদ্দিন দিদিকে দেখেন নি?

ঠিক ঠিক বলতে গেলে আঠারো বছর পাঁচ মাস। বলে মনে মনে হাসলো রবিরঞ্জন। গত পরশু তপতীর তিন রো পেছনে বসে ধ্যান করেছিল রবি। তখন ওর গ্রীবা একটা নিষ্ঠুর জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে দৃষ্টিতে আসছিল।

৫

এষা সকাল থেকেই শেষরাতের স্বপ্নটাকে আঁকবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পর পর পাঁচখানা পাতা নষ্ট হয়ে গেল। ঠিক হচ্ছে না। আঁকতে গিয়ে বার বার গুলিয়ে যাচ্ছিল। ভোরবেলা সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে —একটা সবুজ আলুক্ষেতে একজোড়া বাঘ ঢুকে মুখ দিয়ে মাটি সরিয়ে

কচকচ করে নতুন আলু চিবিয়ে খাচ্ছে। আর খানিকক্ষণ অন্তর আকাশে চোখ তুলে একসঙ্গে দু'জনেই তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছে।

বাঘজোড়ার গায়ে গাঢ় হলুদ আর কালো রঙের লাইন। গোঁফের ঝাঁটা বিশাল বিশাল। চোখগুলো ঘুমন্ত। বসে থাকা অবস্থায় গোটা থাবায় ভীষণ আকারের ভঙ্গী। সবুজ আলুক্ষেতে খয়েরি রঙের মাটি। তাতে হলুদ কালো ডোরা টানা জোড়া বাঘ। তাদের পিছনে ঘন নীল রঙের আকাশ।

এষা তার ভিসন লেখার খাতার দু' পৃষ্ঠা জুড়ে ছবিটা এঁকেছে। কিন্তু কিছুতেই বাঘের পেশীসুদ্ধ থাবা সঠিকভাবে আঁকতে পারছে না। এক সময় বিরক্ত হয়ে বলল, মা একটু আসবে এদিকে? তোমার লেখা হল?

এই হয়ে গেল বলে—

ধ্যানে বসার জায়গা পেরিয়ে ছোট টেবিলে বসে তপতী লিখছিল। লিখতে লিখতে চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। অক্ষরগুলো হারিয়ে যাচ্ছিল। সুবিনয় এখন কোর্টে। চিঠিখানা লেখা একরকম শেষ। উপরে লিখল—

প্রিয় আর জি,

কিছুতেই পুরো নামটা এলো না কলমে। তারপর নিজের লেখা চিঠিই পড়তে লাগল তপতী।

গত আঠারো বছর যাকে তুমি দেখতে চেয়েছো এমন একজন সম্পর্কে তোমাকে এই চিঠি। তোমার সম্পর্কে তার ধারণা সর্বদাই উঁচু। সে জানে—তুমি আজ প্রতিষ্ঠিত। তাই বলছিলাম—একে ওকে বলে তাকে দেখার জন্যে নিজেকে ছোটো কোরো না।

একদিন তাকে তুমি বলেছিলে— দেবী। সে এখন সাধিকা। অতীতের কোনো বন্ধুর সঙ্গে তার আর কোনো পুরনো সম্পর্ক হতে পারে না। এজন্যে জোর করতে গিয়ে তাকে এবং নিজেকে ছোটো কোরো না। সে

এমনই মেয়ে—যার কোনোদিন বাড়ি গাড়ি টাকার লোভ ছিল না। ভগবান তাকে সব দিয়েছে। সে চায় নি কিছু। শৈশব থেকেই সে সাধিকার জীবন চেয়েছিল। তার মন করুণায় পূর্ণ বলে তার প্রতি অন্যের ভালোবাসায় সে কোনোদিন আপত্তি করতে পারে নি।

এই অব্দি পড়ে তপতীর চোখের সামনে লেখাগুলো আবার ঝাপসা হয়ে গেল। কালীঘাট স্টেশনে বজবজের ট্রেন এসে থামলো। একটু পরেই বাঁশি দিয়ে স্টার্ট নিল।

গুরুদেব চাইলে ভবিষ্যতে আমরা কোনো আধ্যাত্মিক পরিবেশে মিলিত হতে পারি। সে কোনোদিন বিয়ে করতে চায় নি। পরিস্থিতিই তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে। বিয়ের পর সে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে আসছে। আত্মার উন্নতির জন্যে সে পরিশ্রমের জীবন কাটিয়ে আসছে। গুরুদেব বলেছেন—দুঃখ আর নিস্পৃহ কাজে আত্মার সমৃদ্ধি ঘটে।

এখন তোমার টাকা এবং সুনাম—দুই-ই আছে। অস্থির জীবন কাটিয়ে তার অপব্যবহার কোরো না। গুরুদেবের জন্যে কাজ করে যাও। তাঁর আশ্রমে ঘুরে এসো। তাঁর কাছে চাইবে শান্তি। তিনি তোমাকে দেবেন। তোমার সব দুঃখ তাঁকে দাও।

১৯৩৭ সনের ২২শে জানুয়ারি আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে মানুষের যাত্রার জন্যে তিনি এই পৃথিবীতে মহাব্রহ্মাণ্ডের আলো নিয়ে এসেছিলেন। তারপর থেকে তোমার জীবনে যা কিছু সুখ বা দুঃখের ঘটনা ঘটেছে—তা সবই ওই আলোর জন্যে। ১৯৫৭ সনে যার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল—সে গুরুদেবেরই দূত।

তার সঙ্গে তোমার একবার কিংবা বহুবার দেখা হওয়া তখনই সম্ভব হবে—যখন তুমি গুরুদেবকে ভালোবাসবে—তার জন্যে কাজ করবে। নিজের কাজ নীরবে করে যাও। তাঁর সমাধিভবনে গিয়ে ধ্যানে বসে প্রার্থনা কর। শরীরের যত্ন নিও। ইতি—

তোমারই সাধিকা

তপতী উঠে দাঁড়ালো। এষা তখনো বসে আঁকছিল। তপতীর মনে হল—ঘরে পুরো আলো আসতো যদি বাগানের দিককার বড় জানলাটা খোলা যায়। নিজের চোখটা কেমন যেন ঝাপসা লাগছিল তপতীর। ওদিকটায় এখনো কতকগুলো সবেদা, আম, কাঠচাঁপার গাছ পড়ে আছে। কে যেন বাড়ি করবে বলে দেওয়াল দিয়ে একটা বড় প্লট ঘিরে রেখেছে। গাছগুলো কাটা হয় নি তার। বড় বড় ঘাসের জঙ্গল রয়েছে সেখানে।

বেলা সাড়ে দশটা হবে।

অনেক জোর দিয়ে তপতীকে জানলাটা খুলে ফেলতে হল।

আরে! আশ্চর্য! বড় আমগাছটার গায়ে লটকানো বড় কাঠের ফলকে পরিষ্কার লেখা—১৯৫৭। বাগানটা থেকে পরিষ্কার আঠারো উনিশ বছর আগেকার আলো উঠে এলো তপতীর তেতলার জানলায়। কতক-গুলো শুকনো পাতা গাছতলা থেকে খড়মড় শব্দ করে উড়ে গেল। পাতাগুলো সেই সময়কার?

তখন '৫৭ সনের তপতীর সঙ্গে রবি বাগানের গেট খুলে ভেতরে ঢুকছে। তপতী পরেছে কলাপাতা রঙের শাড়ি। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। কালো ব্লাউজ। তাতে কাঁধের কাছে পাউডারের সাদা ছিটে লেগে আছে। মনে মনে এখনকার তপতী হেসে ফেলল। রবির সঙ্গে আমি বেরোবার সময় তাড়াতাড়িতে পাউডার মাখতাম। খেয়ালই থাকতো না—ঘাড়ে, জামায় কোথায় তার ছিটে লেগে থাকত।

রবির হাতে পরীক্ষার নোটসের ফ্ল্যাটফাইল। পাঞ্জাবির হাতা গোটানো। ধুতির কোঁচা সামলে রবি তপতীকে নিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। বসে পায়ের কাবলিটা খুলে ফেলল।

কতদিনের জন্যে যাচ্ছ? লণ্ডনেই থাকবে? বোঝাই যাচ্ছিল—রবি অনেক কথা বলতে চায়। একটাও কিন্তু মুখে আসছে না।

তপতী বলল, ক্লাস শুরু হওয়ার আগে ক্রফোর্ড রোডে এক ল্যাণ্ড-

লেডির কাছে ঘর পেয়ে যাব। আমার এক মাসতুতো দাদা থাকেন ওখানে। তিনি লিখেছেন।

কত দিনের জন্যে যাচ্ছ বললে না তো ?

এখন কি করে বলি রবি। কোর্স তো দু'বছরের। বলতে বলতে তপতী দেখলো সে ডান হাতখানা দিয়ে রবির মাথার এলোমেলো চুল ঠিক করে দিচ্ছে। এ দৃশ্য অনেকক্ষণ ধরে দেখার লোভও হচ্ছিল। আবার হাসিও পাচ্ছিল। সিনেমায় তো এইভাবেই নায়িকা নায়কের মাথার এলোমেলো চুল ঠিক করে দিতে গিয়ে বাধা পড়ে—তারপর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গান ধরে। গাছের আড়াল থেকে পিয়ানো বেজে ওঠে।

এসব ভেবেও সেদিনকার ওই তপতীর জন্যে, রবির জন্যে আজকের তপতীর খুব কষ্ট হচ্ছিল।

বিলেতে পড়তে যাওয়া কি তোমার খুবই দরকার ?

বাঃ! এখানে বসে থেকে কি করব। এম. এ. পাস করে তো তেমন চাকরি পাচ্ছি না।

চাকরি যা হয় করবে এখন। আমি একটা কাজ পেলেই আমরা বিয়ে করব।

তুমি তো তিন বছরেও কাজ পেলে না। আর কি তেমন কাজ পাবে ?

পেয়ে যাব তপতী। বলতে কষ্ট হচ্ছিল রবির। এক রকমের অপমান লাগছিল। এত কণ্ডিশন করে ভালোবাসা হয় না কিন্তু।

তুমি তো আমার বাবাকে জানো। টায়ারের সেলস্‌ম্যানের সঙ্গে তিনি কিছুতেই আমার বিয়ে দিতেন না।

সারাটা বাগানের বাতাস জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেল। রবি তার অধিকার ফলাবার আর কোনো পথ না পেয়ে একটা কবন্ধ মূর্তির মতো নীলডাউন হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। বাগানের নুড়ি পাথরে হাঁটু ছড়ে গেল। সেই অবস্থাতেই সে সবচেয়ে সোজা পথ নিল। অধিকারের সোজা পথ। মাথা নিচু করে নিজের ঠোঁট তপতীর ঠোঁটের ওপর একরকম জোর

করেই ঘষে দিল।

তপতীর চোখের চশমা কোলে পড়ে গিয়েছিল। আঃ! ছাড়ো। বলে চশমাটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর যেতে যেতেই বলল, ব্রুট।

এ কথায় রবি যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল। উঠতে পারল না। বরং বাগানের নুড়ি ছড়ানো মাটিতেই বসে থাকল। কোনো রাগ নেই। কান্না নেই। অধিকার নেই। ধোঁয়াহীন, শিখাহীন একটা আগুনের আঁচ তাকে চারদিক থেকে তখন জ্বালিয়ে দিতে চাইছিল।

আজকের তপতী দেখলো—সেদিনকার তপতী গুটি গুটি বড় রাস্তায় পড়ল। ফাঁকা পথ। এদিকটায় তখনো এত বাড়িঘর হয় নি। তপতী হাঁটছেই। বাসস্টপ আরও অনেকটা এগিয়ে। তখন স্টিরিও বাজারে বেরোয় নি। গলার স্বর আর যন্ত্রেব আওয়াজ তখন রেকর্ড থেকে আলাদা আলাদা করে শোনা যেত না। রবির সঙ্গে তার রেকর্ড কবা লংপ্লেয়িংখানা যেন এইমাত্র একটা স্পীকার থেকে বাজতে লাগল। রবির দিকটা ব্ল্যাঙ্ক। শুধু তপতীর দিকটা ছাড়া ছাড়া হয়ে বাজতে লাগলো। তারই গলার স্বর শুধু তাকেই তাড়া করছিল। পথের আর কেউ সে স্বর শুনতে পাচ্ছে না।

রবি। তোমার মতো সুন্দর মুখের মানুষকে আমার খুব ভয় লাগে।

এই সময় লোহা বোঝাই একটা ঠেলা পার হচ্ছিল। উল্টোদিকে কয়লা বোঝাই মোষের গাড়ি। রবির গলার স্বর একদম শোনা গেল না।

জানো আমি খুব ভীতু রবি। বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার যে কিছু করার উপায় নেই। আমি তাঁর প্রথম সন্তান।

ডবলডেকারের পাদানি রাস্তা ঘষটে বেরিয়ে গেল।

আমার মা পর্যন্ত বাবাকে খুব ভয় পান। আমাদের এখানে রেখে দিয়ে বাবা ঢাকায় ওষুধের ব্যবসা করেন। মাঝে মাঝে ওষুধ কিনতে ইণ্ডিয়ায় আসেন। ফিরে যাবার সময় জমি কেনেন, নয়ত কোনো বার বাড়ি

কিনে রেখে যান। আমাদের কোথায় কি সম্পত্তি আমরা জানি না। বাবা আমাদের ভালোর জন্যে করছেন।

পর পর তিনখানা স্টেটবাস উল্টোদিকে যাচ্ছিল। তিনখানাতেই রিজার্ভ লেখা।

আমার এখনো বিয়ে হয় নি বলেই বাবার ইচ্ছেয় আমাকে আরও পড়তে হচ্ছে। আমি এ পড়াশুনোর মানে বুঝি না। তুমিও আমার বাবাকে বুঝতে পারবে না রবি। আমাদের খুব ভালোবাসেন। কিন্তু তাঁর নিজের মতো করে। সে ভালোবাসার কোনো মানে বুঝি না।

সেদিনকার তপতী সেদিনকার বাসে উঠে গেল। আজকের তপতী জানলার গ্রিল ধরে মেঝেতে বসে পড়ল। বসে দেখতে পেল—১৯৫৭ লেখা আমগাছটার ছায়ায় সেদিনকার রবি বিকেলের আলোয় বসে আছে। তেতলার জানলা থেকে তু'বার ডাকবার চেষ্টা করল। শুনতে পেল না রবি। শুনলেও দেখে কি চিনতে পারতো আজকের তপতীকে। ওর এয়ারমেলের চিঠি বিলেতে এসে পৌঁছোতো। তপু, তোমায় না দেখে আমি আর থাকতে পারছি না। লণ্ডনে এখন ক'টা বাজে ?

মা। এবার ত্যাখো। সবটা এঁকে ফেলেছি। আলুক্ষেতে জোড়া বাঘ।

এবার ভিসনের খাতাখানা মেলে ধরে তপতী দেখলো—জোড়া বাঘের ব্যাক গ্রাউণ্ডে আকাশটা পাথুরে তামাটে হয়ে আছে। এখুনি ফেটে গিয়ে কোনো তরল রং গড়াতে থাকবে। মুখে বলল, আর যা দেখেছো —পর পর এঁকে রাখো। নয়ত ভুলে যাবে। মন বড় ভুলো জিনিস।

এষা উঠে যেতে তপতী চেষ্টা করে দেখলো—রবির কথা কি কিছু মনে আছে তার। অনেক চেষ্টা করে বুঝলো, বিশেষ কিছুই তার মনে নেই। আড়াই বছর বিদেশে ছিল। ফিরে এসেও দেখা হয় নি। সেও তো অনেকদিন।

একবার শুধু ফোনে কথা হয়েছিল। রবি বলেছিল, আমার চিঠিগুলো ফেরত দাও।

তপতীর তখন ক'দিন পরেই বিয়ে। আশীর্বাদ হয়ে গেছে। বলেছিল, ফেরত দেব না। আমার চিঠি ফেরত চাই না।
ওগুলো রেখে আমি কি করব ?
সে আমি জানি না রবি। বলেই তপতীর খুব অস্বস্তি লেগেছিল। মাত্র ষোল দিন হয়েছে—দেশে ফিরেছে। একতলায় কাশ্মীরী শালের গোছা থেকে মা নতুন জামাইয়ের জন্যে শাল বেছে উঠতে পারছে না। নিচে থেকেই 'তপু তপু' বলে মা তখন ডাকছে তাকে। খুব লজ্জা করছিল। এই অবস্থায় বলে কি করে যে, বিলেত ছাড়ার কিছুদিন আগে পাস-পোর্টের সঙ্গে চিঠির তাড়াও সে হারিয়ে বসে আছে। ইণ্ডিয়া হাউসে সেই পাসপোর্টের ঝামেলা কাটাতে গিয়েই তো সিঁড়ির মুখে সুবিনয়ের সঙ্গে দেখা।
না। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট নয়। নিজেকেই কেমন অদ্ভুত লাগে তপতীর। সে কি অ্যাবনরমাল? তাই বা বলে কি করে। তাদের এখন একটি মেয়ে। একটি বাড়ি। একজন স্বামী। একজন গুরু। তাহলে ?

৬

সুবিনয় তপতীকে 'মহাব্রহ্মাণ্ডের আলো' অধ্যায়টি পাতা উল্টে খুঁজে দিল। পড়ে ফেল। মনস্থির হবে। শান্তি পাবে।
'কে এই বাবা?' বইখানা গুরুদেবের আশ্রমের পাঠচক্র থেকে প্রকাশিত। সেখানকার রবার স্ট্যাম্পের সিলও রয়েছে। টি ভি-র প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার আগেই এষা ঘুমিয়ে পড়েছে। তপতী পড়তে লাগল—
'গুরুদেব বলেছেন, হৃদগুহায় চৈত্যপুরুষ বাস করেন। তিনিই চিৎশক্তি। তার মধ্যে রয়েছে অপরিসীম সৃজনশক্তি। সে চেতনা বাইরের জিনিস নয়। আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অন্তরালে এক উচ্চতর বুদ্ধি বীজরূপে লুকিয়ে আছে। তার নাম বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের উপরেও রয়েছে দিব্য

আনন্দের বীজ।'

এই পর্যন্ত পড়ে তপতীর মনে পড়ল—এরকম একখানা বই বীথিকে একবার পড়তে দিয়েছিল। ক'পাতা উল্টে বীথি বলেছিল—ওরে বাবাঃ। এ যে দেখছি বাংলা জ্যামিতির ভাষা। ঢংখানা—ইহাই উপপাদ্য বিষয়। এ আমি পারব না দিদি।

তপতী কিন্তু বেশ পারে। পড়তে পড়তে তার দুই ভ্রূর মাঝখানের আজ্ঞাচক্র জেগে উঠলো। মন এক জিনিসে নিশ্চল হলেই তার মাথার ঢাকনা খুলে গিয়ে সেখানে নরম পবিত্র আলো প্রবেশ করে। তখন সারাটা শরীর সাইকেলের টিউব হয়ে যায়। মনের যে কোনো জায়গায় একটু ধাক্কা লাগলেই টং করে বেজে ওঠে। এক একটা অনুভূতি ওই টিউবের ভেতর বাতাস হয়ে ঢুকে পড়ে।

সুবিনয় টেবল ল্যাম্পটা জ্বেলে দূরের টেবিলে বসে কোর্টের কাগজ দেখছিল।

এই শোন—

তপতীর ডাকে ফিরে তাকালো।

রবির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। দেখো খুব ভালো লাগবে।

কোন্ রবি?

রবিকে মনে নেই? বলেই নিজের ভুল বুঝলো তপতী। তোমার তো মনে থাকার কথা নয়। সেই যে লণ্ডনে থাকতে যার কথা বলেছিলাম। যার একতাড়া চিঠি হারিয়ে ফেলেছিলে—

কেন? কলকাতায় ফিরেও তো রবির কথা তোমায় বলেছিলাম। অবিশ্যি অনেক দিনের কথা—

সুবিনয় টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। না আমি ভুলি নি। কিন্তু একটা কথা বলতে চাই তোমাকে তপু। রবির সঙ্গে এখনো আলাপ করার সময় হয় নি।

আঠারো বছর তো পার হয়ে গেল। তবুও নয়?

না। তুমিও দেখা কোরো না। যা সেনসেটিভ তুমি—তাতে চাঞ্চল্য আসবেই। অস্থির হবে। চঞ্চল হলে আর মনস্থির করতে পাববে না। জানো তো—আমাদের জীবন এখন ধর্মের জীবন।

টেবিল ল্যাম্পের আলো সুবিনয়ের বুক অব্দি পৌছেছে। তার ওপর থেকে সুবিনয়ের বাকীটা অন্ধকার। শুধু চশমার কাচ চিকচিক কব-ছিল। তাই ওর গলা দৈববাণীর মতোই শোনাচ্ছিল।

সুবিনয় এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রাখতেই তপতী ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলো।

তপু তোমার এখন নতুন করে কোনো ইমোশনাল অ্যাটাচমেণ্ট হলে আমি দাঁড়াব কোথায়?

কী পাগলের মতো বকছো সুবিনয়?

পাগল নয়। মানুষের এইভাবেই হয়। তোমার জন্যে আমি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। তুমি কিছু করে বসলে আমি কোথায় দাঁড়াব?

অজান্তেই তপতীর ডান হাতখানা সুবিনয়ের কব্জি চেপে ধরল।

খানিকক্ষণ দু'জনের কেউ কোনো কথা বলতে পারল না।

একটু পরে তপতীই প্রথম কথা বলল। আজ শোবার আগে আমি আর তুমি একসঙ্গে ধ্যানে বসব।

বেশ তো।

ধ্যানের জায়গাটি বড় সুন্দর। সাধারণ একখানা সতরঞ্জি পেতে ওরা দু'জন পাশাপাশি বসে থাকে। সেই সময়টা বড় একাত্ম মনে হয় দু'জনার। পদ্মাসনে বসে প্রথমে ডান হাতখানা নাভিমূলে অঞ্জলির মতো মেলে ধরতে হয়। তার ওপরে বাঁ হাতের পাতা আরেক প্রস্থ অঞ্জলি হয়ে এসে থামে। দেহ তখন আসন থেকে উঠে দাঁড়ানো ঋজু তরু। সুবি-নয় অনেকদিন পরে মাথা ঝুঁকে তপতীর ঠোঁটে আলগোছে চুমু খেল। তপতী বলে ফেলল, অনেকদিন পরে। তাই না?

একটা ভুল শোধরানোর মতোই সুবিনয় পরিষ্কার গলায় বলল, শরীরকে আমাদের এতটা বড় করে তোলা ঠিক নয়।

তপতী তখন অন্য জগতে ছিল। সব কথা তার কানে যাচ্ছিল না। নিজের সঙ্গেই কথা বলে উঠলো, যেদিন তুমি চুমু খাও—সেদিন আমার ঘুম ভালো হয়। মনে হয় সারাদিন পরিশ্রম করে ঘুমে ঢলে পড়লাম। দু'একদিন স্বপ্ন আসে ঘুমের ভেতর। ভোরবেলা তার কিছু মনেই থাকে না।

সুবিনয় আবার তার টেবিলে ফিরে গেছে। চোখ কোর্টের কাগজে। সেখান থেকেই তপতীকে বলল, আমাদের মন গুরুতে সমর্পণ করেছি। এখন আমাদের সেবার জীবন। এই শরীরের সেখানে কি মূল্য।

খচ করে ঘুরে তাকালো তপতী। কারণ, কথাটা হল—শরীর। এই কথাটা তাকে অল্প বয়স থেকেই যন্ত্রণা দিয়ে আসছে। এই জিনিসটা অল্প বয়স থেকেই তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। কবিরা কবিতায় যখন—শরীর লেখে—তখন কবিতাটাকে তপতীর আগাগোড়াই ঘরমোছার ভিজে-বস্তা বলে মনে হয়। পায়ে রাখার জিনিস। আর কোনো শব্দ নেই?

শরীর ছাড়িয়েও আমি আছি। আমার নাম তপতী। লোকে প্রথম শরীরে তাকায়। দরজা খুলে গেলে মনে পা দেয়। যাদের খোলে না—তারা হতভাগিনী। যেমন আমার ছোট বোন বীথি। বিয়ের এত-দিন পরেও এই শরীর জিনিসটায় ও কত কি মাখে। একবারও ভাবে না—নিজের মুখখানা দিনকে দিন মাটির সরা হয়ে উঠছে। মাটির পাত্রে কোনো প্রতিবিম্ব পড়ে না। সেটা জানেই না।

তুমি কাকে সেবা কর সুবিনয়? নিজের জন্যে মাছ ভাত খাওয়া তো ছাড়ো নি।

শরীর থাকলে তা করতেই হবে।

আঃ! আর কতবার শরীর শরীর করবে? তোমার কাছে না ও জিনিসের কোনো দাম নেই?

এখনো একেবারে নেই বলতে পারছি না। তবে কমে আসছে।

তার মানে একদিন অনেক ছিল সুবিনয় !

ছিলই তো। সবারই থাকে। আমাদের একটি সন্তান। একদিন তোমার শরীর নিয়েও ভেবেছি। অস্বীকার করতে পারব না। নইলে বিয়ে হল কি করে আমাদেব। তুমিও কি ভাবো নি ?

কার শরীর ?

নিজের। এবং আমার। ভাবতেই হবে। জ্ঞান লাভেব জন্যে শাস্ত্র। জ্ঞানার্জনের পব শাস্ত্র ঝবে যায়।

তাহলে দেহ ধবে আছো কেন ?

ইচ্ছে করে এর বিনাশ ঘটানো পাপ।

সুবিনয়ের কথায় কথা বাড়ছে। গুরুদেব তো বলেছেন —মানুষের পক্ষে পাপ পুণ্য বলে কিছু নেই।

সুবিনয় হেসে ফেলল। আজ তুমি একদম সেতারের তার হয়ে আছো। বাতাস লাগলেই বেজে উঠবে। এজন্যেই বলেছিলাম— রবিবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হলে ইমোশনাল ইমব্যালান্স ঘটতে পারে। তখন আমার দাঁড়াবার মতো কোনো শেল্টার থাকবে না। তোমার জন্যে আমি মা, বাবা, ভাই-বোনেদের ছেড়ে চলে এসোছ। তুমি সরে গেলে আমি কোথায় যাব ?

ঠিক এই সময় দু'জনই একসঙ্গে দেখতে পেল—ওদের মেয়ে এষা ওর ছোট পালঙ্কে ঘুমের ঘোরে পাশবালিশ হাতড়াচ্ছে। খুঁজে পাচ্ছে না।

তপতী উঠে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার আগেই সুবিনয় এগোলো। তুমি বোস।

খেতে বসে তপতী সুবিনয়কে এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছিল। লোক মোটে দু'জন। টেবিলে একগাদা স্টেনলেসের বাটি, থালা। তপতী বিশেষ কিছু নেয় নি দেখে সুবিনয় রেগে গেল। আরেকখানা মাছ নাও। না খেলে শরীর থাকবে কি করে ?

আঃ! আবার শরীর শরীর কোরো না। বিচ্ছিরি লাগে শুনতে।

এই শরীর কথাটা তার সারা জীবন ধরে তপতীকে জ্বালা দিচ্ছে। প্রথম যখন শাড়ি ধরল তখনই একটা আভাস পেয়েছিল। তার এক নম্বর শত্রুর নাম—শরীর। এই শরীর তার চোখে মানুষকে খেলো করে দিল।

শোবার আগে দু'জনে পাশাপাশি ধ্যানে বসে টের পেল—আলাদা আলাদা করেই টের পেল—দু'জনের কারো মন স্থির হয় নি!

সুবিনয়ের মনে পড়ছিল অন্য কথা। কোথায় গেল আজ্ঞাচক্র! কোথায় গেল সহস্রা! মহাব্রহ্মাণ্ডের আলো তাকে এখন গুরুদেবের জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে বিয়ের কয়েকমাস আগেকার একটা উইক এণ্ডে নিয়ে গেল। ইংল্যাণ্ডের সাসেক্স। তপতীকে নিয়ে সুবিনয় বেড়াতে বেরিয়েছে। মে মাস। গম পেকে হলুদ। কাঠের বাড়ির লালনীল ছাদ। কালো অ্যাসফল্টের রাস্তার জায়গায় জায়গায় কন্টিনেণ্টের নানা দেশের নানা রঙের গাড়ি। হালকা মেরুন রঙের কার্ডিগান গায়ে তপতী গাড়ির ডিক থেকে তৈরি খাবারের ক্যারিয়ারটা বের করে নিয়ে পথের ধারের গাছতলায় বসে পড়ল।

জানো। আজ রবির শেষ চিঠিটা পেয়েছি। আমি কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে তো ওকে বিয়ে করতে যায় নি। গিয়েছিলাম—পরীক্ষার পড়াশুনো করতে। সেকথা কিছুতেই বুঝবে না রবি। ভীষণ কষ্টমাখানো চিঠি লিখেছে।

মিশেছিলে। তাই লিখেছে। আমার এখন ওসব কথা ভালো লাগছে না। তুমি যদি 'না' বলতে তাহলে আমিও অমন কষ্ট পেতাম।

সেজন্যেই তো আমি গোড়া থেকে বলছি সুবিনয়—এ মেশামিশি অর্থহীন। আমি কোনোদিন কারও ভালোবাসায় আপত্তি করতে পারি না। আমাদের বিয়ের পরেই দেখা হওয়াটা অনেক ভালো।

তার মানে তো এখনো তিন মাস অন্তত:। সেই দেশে ফিরে গিয়ে

টোপর পরে তবে—

কিংবা সুবিনয় বিয়েটা ঠিক করে তবে এই দেখাশুনো—

তুমি খুব কণ্ডিশন করে মেশো—তাই না?

আমি একটা বাজে মেয়ে। আমার জন্যে এতটা করছো কেন? তুমি তো দেশে ফিরে অনেক মেয়ে পাবে।

দরকার নেই আমার। এই একটিতেই আমার—

সুবিনয় মনস্থির করতে চেষ্টা করল। মনে মনে গুরুদেবের পাদ-পদ্ম স্মরণে নিল।

ঠিক তখন তপতী বেলভেডিয়ারে ন্যাশানাল লাইব্রেরির গেটে বাস থেকে নামল। লাইব্রেরিয়ান কেশবন অনেক ফুলগাছ লাগিয়েছেন মাঠভরে। কেন্দ্রীয়সরকারেরবেতনভূক একটি বলদ নিয়ে মালী খানিকটা জায়গায় লাঙল দিচ্ছে। মরশুমি ফুলের চারা বসাবে। আশ্চর্য! সরকারী চাকরিতে বলদও নেওয়া হয়।

সিঁড়ি ভেঙে ভেতরে ঢুকে লম্বা টেবিলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল তপতী। রোজ একটি ছেলে বই পড়তে পড়তে তার দিকে চুপ করে তাকিয়েথাকে। নিওনের আলোয় বড় বড় চোখ। তপতীও না তাকিয়ে পারে নি। প্রথম প্রথম ভাবতো—ছেলেটি বোধহয় অন্য কারও দিকে তাকিয়ে আছে। এইতো দিন তিন চার হল বুঝতে পেরেছে—শ্রীমান তার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। পলক পড়ে না তখন চোখে। তপতী পাল্টা তাকালেই চোখ নামিয়ে নেয়। কাল এই সময় হাসি এসে গিয়েছিল তপতীর মুখে।

লাইব্রেরির মেঝে কাঠের তৈরি। সিলিং অনেক উঁচু। বই পড়বার সুবিধের জন্যে ঢাকনা পরানো নিওন। অ্যালকভগুলোতে রাশি রাশি সুন্দর বই। যে কোনো একটা নামিয়ে নিয়ে সারাদিন ধরে পড়। ফুরোবে না। চোখ ঝিমঝিম করলে বাইরে বেরিয়ে সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকো। ঘুম পেলে চা আছে ক্যান্টিনে। সন্ধ্যেবেলা পাশের

চিড়িয়াখানা থেকে বাঘের ডাক ভেসে আসে।

বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে হবে। লাইব্রেরির বাইরের বারান্দায় চশমা মুছে তপতী মাঠ, ফুল, দূরের সরকারী কোয়ার্টারগুলো এলোমেলো-ভাবে দেখছিল।

কাল হাসছিলেন কেন আপনি ?

চমকে চোখের কোণ দিয়ে দেখলো তপতী। সাহস তো কম নয়। চোখে চোখ পড়লে নামিয়ে নেয়। আর এখন সরাসরি এমন কোশ্চেন করছে ? কোঁচা ঝুলিয়ে ধুতি পাঞ্জাবি পরেছে। মাথায় এলোমেলো চুল। হাতে নিশ্চিয় চারমিনার। এসব ছেলেদের তাই থাকে। হয়তো বাংলা পড়ায় কলেজে। দেখাচ্ছি মজা।

কোথায় ? মাপ করবেন। আমি তো আপনাকে চিনি না।

খুব আশা করে কথা বলতে এসেছিলো নিশ্চয়। কালকের হাসির আশকারা। তপতীর কথায় একদম অন্ধকার হয়ে গেল মুখখানা। আহা রে !

আপনি আমায় চেনেন না ? একদম চেনেন না ?

না।

মনে করে দেখুন তো। একজন রোজ আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—

নিজের ওপর কী ভরসা নিয়ে কথা বলছে। হাসি পেলেও গম্ভীর ভাবটাই বজায় রাখলো তপতী। আর সেই ভঙ্গিতেই বলল, এখানে তো পড়তে আসি। অনেকেই তাকিয়ে থাকতে পারে। আলাদা করে কাউকে তো মনে থাকার কথা নয়।

ঘাবড়ে গিয়ে রবি সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলল, ঠিকই তো। ঠিকই তো। সঙ্গে সঙ্গে এও তার মনে হল—মেয়েটি তো আচ্ছা ঝানু। তার পরিষ্কার মনে আছে। হাসি চাপতে না পেরে হেসেই তাকিয়ে থাকে এক পলকে—তাহলে কোন্ মেয়ে না খুশী হয়। সেজন্যেই হেসে ফেলে-

ছিল নিশ্চয়।

কিন্তু আমার তো পরিষ্কার মনে আছে—আপনি কাল বিকেল সওয়া চারটেয় আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিলেন। আপনাকে তখন ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

শঙ্কিত হয়ে আশপাশে তাকিয়ে নিল তপতী। কেউ শুনছো না তো। না।

সময় পর্যন্ত মনে আছে? বাঃ। আপনি বুঝি তাকাবার জন্যে লাইব্রেরিতে আসেন? আমার কিন্তু পরিষ্কার মনে আছে—আমি কারও দিকে তাকিয়ে হাসি নি।

মনে মনে হেসেছিলেন। তাই হবে। আমি বুঝতে পারি নি।

এমন আত্মবিশ্বাস নিয়ে রবি কথা বলে যাচ্ছিল—যার ফলে এবার সত্যি সত্যিই তপতী একদম সামনাসামনি হেসে ফেলল।

খুব সমঝদার দর্শকের সীরিয়াস ভঙ্গিতে রবি তখন বলে যাচ্ছিল-হ্যাঁ ঠিক এইভাবেই—এইভাবেই আপনি কাল বিকেলে হেসেছিলেন। তবে লাইব্রেরি তো—তাই অনেক মৃদু ছিল হাসিটা।

আপনি বুঝি সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন।

সব নয়। আপনাকে দেখি। রোজ। তা তিন চার মাস তো হবেই—তপতী মনে মনে হিসেব করে দেখল—হ্যাঁ। ঠিক। তিন চার মাসই সে লাইব্রেরিতে আসছে। গম্ভীর হয়ে বলল, আমায় দেখেন কেন?

চোখের শান্তি। মনের আরাম।

পড়াশুনোর ক্ষতি হয় তো।

মোটেই না। যেদিন আসেন না—সেদিন বরং পড়াশুনো খারাপ হয় না। বুধবার আসেন নি। সন্ধ্যেবেলা বাঘের ডাক শুনে বাড়ি ফিরলাম। একটি পাতাও নোট নিতে পারি নি সেদিন।

তপতী হিসেব করে দেখলো—ঠিক তো—গত বুধবার সে আসে নি লাইব্রেরিতে। বীথি ডাক্তারিতে ভরতি হবে বলে খোঁজখবর নিতে ওর

সঙ্গে আর জি কর-এ গিয়েছিল। পারেন নি কেন?
সব কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলা যায়। চলুন ক্যান্টিনে পনের মিনিটে চা খেয়ে আসবো। ঘুম পাচ্ছে বড্ড।
না। আমি এখন চা খাবো না।
আজ আমার জন্মদিন। চলুন না। কেক খাওয়াবো চায়ের সঙ্গে—
জন্মদিন বুঝি? হাঁটতেহাঁটতে ওরা দু'জনে চিল্ড্রেন্স লাইব্রেরি পেরিয়ে ক্যান্টিনের দিকে চলল। কত বয়স হল?
পঁচিশে পা দিলাম। আপনার বয়স?
মেয়েদের বয়স জানতে চাইতে নেই। এটাও জানেন না!
সত্যি জানতাম না। একটা জিনিস শিখলাম আজ। আপনি খুব বিদুষী।
এটা শেখালাম বলে?
নাঃ। আপনি যেসব বই পড়েন—বাবাঃ! রিকুইজিশন স্লিপেই বইয়ের নাম দেখে আমার চক্ষুস্থির।
আমি কি বই পড়ি—তাও দেখেছেন?
সব দেখতে হয় আমাদের। কেক নিচ্ছেন না কেন?
তপতী সুবিনয়ের আগেই ধ্যানের আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। এত দিন পরে এ তার কি হল।

৭

সন্ধ্যের দিকে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে ডায়মণ্ডহারবার রোডের দিকে এগোবে তপতী। অফিসপাড়ার গাড়িগুলো ভেতরে কোট ঝুলিয়ে আলি-পুরে ফিরছে। ভীষণ স্পীড্। রাস্তা পেরোনো যাচ্ছিল না।
চলে এসেছেন। আমিও চলে এলাম।
এবারে সত্যিই বিরক্ত হল তপতী। আমি তো ওদিকে যাব।
আমিও ওদিকে যাব।

ওদিকে থাকেন আপনি ?

না। আমি থাকি তো টালিগঞ্জে।

তাহলে ?

আপনি যাচ্ছেন তাই যাব।

সে কি কথা। রীতিমত ভ্রূ কুঁচকে গেল তপতীর। আপনি আমায় ফলো করবেন ? ছিঃ ছিঃ !

ওভাবে বলছেন কেন ? অজানা খারাপ লোক ফলো করে। আপনি তো আমায় চেনেন।

কোথায় চিনি ! আজই তো মোটে আলাপ হল।

তাতে কি হয়েছে। খারাপ লোক মনে হল ? চলুন ?

খুব হাসি এসে যাচ্ছিল তপতীর। আমার সঙ্গে গিয়ে কি করবেন ? আজ আপনার জন্মদিন—বাড়ি যান।

বাঃ ! তার চেয়েও বড় ঘটনা আজ ঘটলো।

রাস্তা পেরিয়ে তপতী দাঁড়িয়ে গেল। সামনেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কি ঘটলো আবার ?

আপনার সঙ্গে আলাপ হল।

ওঃ ! কিন্তু আমি যে এখন ডাক্তারখানায় যাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে থাকব। তার বেশী নয়।

ভালো। কিন্তু ডাক্তারখানার আগেই ফিরে যাবেন। ডাক্তারবাবু বাবাকে চেনেন।

না চিনলে যেতে দিতেন ?

অত ভাবি নি। বলতে বলতে তপতী বুঝলো এই অপরিচিত মানুষটার সঙ্গে সে একরকম প্রায় প্রেমিক-প্রেমিকাদের মতোই অনির্দিষ্টভাবে হাঁটছে। অবশ্য জানে ট্রাম লাইনে পৌঁছেই ছেলেটিকে বিদায় দিতে হবে। আর ওকে নিয়ে এগোনো যাবে না।

বলুন লজ্জা। আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ?

বলুন—

আরেকটু আস্তে হাঁটবেন। দয়া করে—

কেন? এর চেয়ে আস্তে হাঁটা মানে তো খোঁড়ানো!

না। আরেকটু আস্তে। বলতেবলতেতপতীর পায়ের দিকে এমন করে রবি তাকাচ্ছিল যেন, তপতীকে সে হাঁটা শেখাচ্ছে।

ওকি। পায়ের দিকে তাকাচ্ছেন কেন? দাঁড়িয়ে পড়ল তপতী। সামনের নতুন পুলিশ কোয়ার্টারেরসামনেবোধহয়বৃটিশআমলেরই পুরনো বিশাল গুলমোহর গাছটা শুধু ফুল ঝরাবার ডিউটি পেয়েছে।

আপনি হেঁটে যাচ্ছেন। আর নিজন পিচ রাস্তায় একটা করে পদ্ম ফুটে উঠছে—

আপনিদেখছিখুবসেকেলে। আমিকিন্তুএবার জোরেহাঁটবো। নইলে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে যাবেন।

এইটুকু তো রাস্তা। জোরে হাঁটলে এক্ষুনি ফুরিয়ে যাবে। ট্রাম লাইনে গিয়ে তো আমায় বাড়ি ফিরতে বলবেন। তখনআমারকিহবে?

ফিরে যাবেন।

আপনার কি! জানতাম, বলতে একটুও আটকাবে না।

তাই বলে আমি বাড়ি ফিরব না? ইঞ্জেকশন নেব না?

ইঞ্জেকশন?

হ্যাঁ। একটা ফোড়া উঠছে গালে—

তাইসারাক্ষণহাতদিয়েঢেকেবসেথাকেনলাইব্রেরিতে। বলবেনতো।

চলুন—

ট্রামলাইন থেকে ফিরে যাবেন বলুন।

মাথা নিচু করে ফেলল রবি। যাব।

কী একবার ভাবল তপতী। তারপর বলল, আমি চেম্বার থেকে না বেরোনো অব্দি ওই গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকবেন।

মাথা নাড়লো রবি।

ছুটতে ছুটতে যাবার সময় তপতী হেসেই বলল, ইস্ ! দেখুন তো জন্ম-দিনটা কীভাবেই কাটছে আপনার।

আজ সকালেও ভাবি নি—এত সুন্দর কাটবে।

তপতী অবাক হয়ে গেল। ফোড়ায় ক'দিন হল—তার চিবুকের বাঁ দিকে খানিক জায়গা ব্যথায় প্রায় অসাড় হয়ে আছে। কিন্তু এইমাত্র সে মাটির পৃথিবীর ওপরকার ট্রামলাইন, পিচরাস্তা, ফুটপাথ একরকম উড়ে পার হয়ে এলো। ডাক্তারবাবুর কথায় হ্যাঁ, না ইত্যাদি কোনোক্রমে জবাব দিয়ে ইঞ্জেকশানটা নিয়েই বেরিয়ে এলো।

তাকে দেখে সন্ধ্যার আলোয় একটা দাঁড়ানো মানুষের মুখ এতখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে আগে কোনোদিন তা জানতো না তপতী। এরকম কথাবার্তা, নির্জন পথ ধরে দু'জনের হাঁটাহাঁটির গল্প সে ইউনি-ভার্সিটিতে থাকতে দু'একজনের মুখে শুনেছে। আর গল্পের বইতে পড়ে থাকতে পারে। তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। ব্যাপারটা যে এরকম—তাতে যে আনন্দ হয়—সে-স্বাদ আজই প্রথম পাচ্ছিল তপতী।

সে বাবা মায়েব প্রথম সন্তান। এখনো তার যা প্রথম মনে পড়ে—সেই আবছা ছোটবেলায় মা বাড়িতে বসে কাঠের আঁচে কীসব ওষুধ জ্বাল দিত। সে-সব শুকিয়ে নিয়ে বাবা চকচকে নতুন কৌটোয় ভরে কাগজের লেবেল মেরে দিত। তারপর সেসব ঝোলায় ভরে সাত দিন দশ দিনের জন্যে বেরিয়ে পড়ত বাবা। ফেরার সময় গুড়, গজা, আলতা, ওল নিয়ে ফিরতো বাবা। ক'দিন খুব আনন্দ হোত। সে দিনগুলোই ভালো ছিল। সংসারের হাল ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বাবা যে কেমন হয়ে গেল। এখন আসেই কম। পেটি পেটি ওষুধ চলে যায় ঢাকায়। বাবা যায় পেছন পেছন। ফুরিয়ে গেলে আবার আসে এদেশে। ফেরত যাবার সময় জায়গা কেনে, পুকুর কেনে, বাড়ি কেনে—নয়ত ফিক্সডে টাকা রেখে যায়। আর মায়ের মাথার চুলগুলো শুধুই পেকে যায়। বাবা এবার যাবার সময় বলে গেছে—নিউ আলিপুরের জায়গাটায় একটা বড় করে বাড়ি করবে।

ফিরেই ভিতপুজো করবে। পাঠক পাড়ার এই ভাঙাচোরা বাড়িটায় আর নাকি মানায় না। সংসারের হাল এত ফিরিয়ে ফেলেছে বাবা। হস্টেলে থেকে থেকে বীথিটা পড়াশুনোয় ভালো হয়েছে। এক চান্সেই হয়তো আর জি কর-এ সিট পেয়ে যাবে। বাকী থাকে গণেশ। পড়ছে এখন। এখন তাদের এই একমাত্র ভাইটি বড় হয়ে উঠছে। গণেশ এখন পাঠকপাড়ার যুগলকিশোর ব্যায়ামাগারে কলেজ থেকে ফিরে বিকেলে ব্যায়াম করে। অঙ্কুর বেরোনো ছোলা খায়।

যত দিন যাচ্ছে—মায়ের মুখের হাসি শুকিয়ে আসছে। সংসারের হাল যতই ফিরছে—ঢাকায় যতই ক্যাপস্থুলের পেটি নিয়ে যাচ্ছে বাবা—ইঞ্জিনীয়ার নিউ আলিপুরের বাড়ির প্ল্যান যতই পাকা করে ফেলছে—মায়ের কপালে ভাঁজও পড়ছে তত। সারাটা বাড়িতে কী যে একটা গুমোট চেপে বসে থাকে সারাদিন। ঠাকুমা পর্যন্ত এক একদিন চুপচাপ বারান্দায় বসে থাকে। বাবার নামে জপের মাত্রা বাড়িয়ে ফেলে।

তার ভেতর আজকের এই দিনটায় সকাল থেকেই যেন শিউলি ঝরে পড়ছে। এত হাসি। এত শাদা। কোনোদিন তো আর এমন আনন্দ হয় নি।

চলুন না একটা পার্কে গিয়ে বসি।

এখানে কি পার্ক পাবেন ? তার চেয়ে বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে জন্মদিন করুন না কেন।

আর কিভাবে বলব—আমার এ-জন্মদিনে সবচেয়ে বড় উপহার আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া। দেখুন আমার হাতে হাত দিয়ে। আমি কাঁপছি। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না—আপনার সঙ্গে কথা বলছি। ভয় হচ্ছিল—আপনি যদি ডাক্তারবাবুর চেম্বার থেকে আর না বেরিয়ে আসেন—

আপনি এত টেন্স কেন ? আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আমায় আপনি কত দিন ধরে দেখছেন ?

লুকিয়ে না খোলাখুলি ?

একদম গোড়া থেকে বলুন।

বোরিং লাগবে আপনার।

মোটেই না। ভালোও তো লাগতে পারে। তাই তো লাগা উচিত। কেমন না?

পার্কের বেঞ্চে কিংবা কোনো রেস্তোরাঁয়—

ও দুটোর কোনোটাই এ পাড়ায় পাবেন না। হাঁটতে হাঁটতেই বলুন। এ-পাড়ায় শুধু গ্যারেজ আর ঝালাই কারখানা। আমাদের দেখবার মতো কারো সময় নেই এখানে। এই তো ভালো।

এবারে একদম সরাসরি তপতীর চোখে চোখ পড়ল রবির। ঘন, স্তব্ধ মুখশ্রী। এই মেয়েটি কি দিয়ে বানানো। গড. নোজ। ফুলেল তেলের মতোই সন্ধ্যের বাতাসটাও আজ সুগন্ধি। জলভরতি কলসী মাথায় একজন পশ্চিমা মহিলা গঙ্গায় চলেছেন। পেছনে ঢাক, ঢোল, কাঁসি। বাচ্চা ছেলের দঙ্গল। ব্যাপাবটাই কেমন মঙ্গলময়।

পরীক্ষার হলে ফেল করাব মুখে টুকতে বসে দু'চারবার ভগবানকে ডেকেছে রবি। কিন্তু সে তো কোন্ সেভেন এইটে। ম্যাথ্‌মেটিকসের দিন। তাছাড়া লাইটপোস্ট নিরিখ করে ঢিল ছুঁড়তে গিয়ে ভগবানের কথা মনে এসেছে। যদি লাগে তো এবারে ঠিক প্রোমোশন পেয়ে যাব। নয়ত নয়। ভগবানের জন্য আলাদা করে সে কোনোদিন বিশেষ টাইম দেয় নি। ভগবানের জামা কাপড়, নাক মুখ চোখ—এসব সম্পর্কে তার কোনোই ধারণা নেই। ভক্তি বা অভক্তি কোনোটাই তার নেই। কারণ, ভগবানকে সে দেখে নি। চেনেও না।

অথচ এই মেয়েটিকে তার একরকম ভগবানের মতোই লাগে। যেন কিছু একটা অপার্থিব। এখানে থাকবার নয়। বাই চান্স দেখা হয়ে যাচ্ছে। সময় হলেই চলে যাবে। অথচ জুতো পায়ে দেয়। শাড়ি পরে। চোখে চশমা। কানে দুল। হাতে বালা। হঠাৎ দেখলে আর পাঁচজন মেয়ে-লোকের মতোই লাগবে। তাই খুঁটিয়ে দেখতে হয়। আসলে কে ও

তখনই ধরা পড়ে। ওর রিকুইজিশন স্লিপে দেখেছে—কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভারতীয় দর্শনের বই পড়তে নিয়েছে। আজ প্রায় তিনমাস ধরেই পড়ছে।

কত দিন ধরে দেখছেন আমায় ?

মাস তিনেক বোধহয়। আগে লুকিয়ে দেখতাম। আমার পড়াশুনো মাথায় উঠেছে। শেষে আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। আপনিও আমায় দেখতেন মাঝে মাঝে। আচ্ছন্ন বলে প্রায়ই আমি চোখ ঘোরাতে ভুলে যেতাম। কালই বিকেলে একদম ধরা পড়ে গেলাম। আপনি আমার সে অবস্থা দেখে হেসে ফেলেছিলেন।

ভূতগ্রস্ত উটপাখিও বোধহয় এভাবে কথা বলে না। তপতীর তাই মনে হচ্ছিল। আর মনে মনে হাসছিল। ওই তুলনাটা তার মনে এলো কী করে তপতী তা বলতে পারবে না। রবি তখন নিজের মুখখানা একদম নিস্পৃহ সাইনবোর্ড করে কথা বলতে বলতে সোজা এগোচ্ছিল।

হাসব না ? ওভাবে কেউ ধরা পড়ে ! তাকাতেই দেখি—সেই তন্ময় হয়ে আমায় দেখছেন। আমি যে দেখে ফেলেছি—তাও খেয়াল হয় নি প্রথমে আপনার—

আজ লাইব্রেরির বারান্দায় আপনি যদি কথা না বলতেন—কিংবা ধমকে উঠতেন—তাহলে আমি দড়াম করে পড়ে যেতাম।

ওমা ! কেন ?

কথা বলছি আর কাঁপছি। জ্বর এসে গেছে ভয়ে।

কিসের ভয় ? তপতী দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনেই একটা মৃত পার্ক। সারা গায়ে ঘুটের মেডেল। আলো প্রায় নেই। সামনেই একজোড়া অন্ধকার জানলাসুদ্ধ ভাড়া বাড়ি একটা। হাইড্রেন্টের জল ঝরঝর করে ঝরে যাচ্ছিল। সেই শব্দে রবির মনে হল—সে একটা শান্ত ঝরনাতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখন ভোরবেলা। তার মুখ তখন আকাশের দিকে।

জানি না।

আপনি তো কাঁপছেন। আপনার কি হিস্টিরিয়া আছে?

না।

তবে কিসের ভয় আপনার? এত কাঁপছেন কেন? হাত ধরে ফেলল তপতী।

যদি বলে বসেন—'না। আমি তোমাকে ভালোবাসি না।'

রবির হাত ছেড়ে দিতে গিয়ে বরং জোর করেই ধরতে হল তপতীর। চোখের ভেতরে টিউব থাকলে তবে এরকম বড় বড় ফোঁটায় জল ফুলে ওঠে।

আঃ। কোনোদিন কোনো মেয়ে দেখেন নি নাকি আগে? ভয় হচ্ছিল। আবার বিরক্তিও লাগছিল তপতীর।

কোনোদিন তোমাকে দেখি নি এর আগে। আমার কোনো উপায় ছিল না তপতী—

রবির এবারের ঘুরে তাকানো মুখখানা, তাতে চোখে দাঁড়ানো জলের ওপর রাস্তার অস্পষ্ট আলো মুহূর্তে স্পষ্ট হয়েই মিলিয়ে গেল। ঠিক এই-সময় তার নিরুপায় মুখখানা তপতীর ভেতরকার জানাশুনো ঘাটটাব পরিচিত একটা ধাপ একদম ধসিয়ে দিল। স্বপ্নে ঠিক এভাবেই লোকে এক ধাপ পিছলে গিয়ে জেগে যায়।

সবে আজ আলাপ। তাতে নাম ধরে তুমি বলে ডাকছে। এ কথা এক-দম মনে এলো না তপতীর। আজই চা খেতে বসে ক্যান্টিনের টেবিলে ওর ফ্ল্যাট ফাইলটা নজরে এসেছিল। সেখানে লেখা নামটা আজ বিকেল থেকেই তপতীর জানা।

জানি রবি। চলো—বড় রাস্তায় যাই—বাড়ি ফিরতে হবে না! বলেই খানিক পরে টের পেল, সেই ভূতগ্রস্ত উটপাখিটার পিঠে হাত দিয়ে প্রায় ঠেলেই বড় রাস্তায় নিয়ে যেতে হচ্ছে তাকে। এখন ঘাটলার হারানো ধাপটার শূন্য তার বুকের ভেতর আরাম হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

রবির রবিতে ফিরে আসতে বিশেষ সময় লাগল না। তবুও এখনও যেন

আগের চেয়ে একটু দূর দূর দিয়েই হাঁটছে।

জানো। আমার সুন্দর মুখকে কিন্তু বড় ভয়। আমার মা বলেছেন—কখনো সুশ্রী মুখের মানুষকে বিয়ে করবি না।

তোমার বাবার মুখ বোধহয় খুব সুন্দর।

কি করে জানলে?

এমনি। অন্য কথায় চলে গেল রবি। একটা ট্যাক্সিও নেই। ফিরতে রাত হয়ে যাবে তোমার।

ট্রাম যে ভিড়ে খেয়া নৌকোর দশা! উঠবে কোথায়?

আজ আর ওঠা হচ্ছে না! হেঁটেই যেতে হবে আগাগোড়া। আজ না ব্রিগেডে নেহরুর মিটিং ছিল। তারপর তপতী ঘড়ি দেখে বলল, ঘণ্টা-খানেকও সভা ভাঙে নি। এ ভিড় এখন চললো।

তবে হাঁটি চল দু'জনে।

তুমি শুধু শুধু এতটা পথ হাঁটবে কেন রবি?

আমার কিছু হবে না। কষ্ট তো তোমার। রিকশা নেব?

না। না। প্রথম দিনেই এতটা ভালো নয়! বুঝেছো!

দেখে কে বলবে! আজই তোমার সঙ্গে প্রথম কথা বলেছি।

কেন? আমি কি এমন হাতি ঘোড়া! তোমার চোখের দোষ। নয়ত আমি তো সামান্য একটা মেয়ে।

তাই থাকো। এখান থেকে চলে যেও না কিন্তু।

কোথায় যাব!

তুমি তো এখানকার নও। ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছো মাত্র।

৮

রাত থাকতে উঠলো তপতী। তখনো ধ্যানের ব্রাহ্ম মুহূর্তের অনেক দেরি। কালীঘাট স্টেশন এখন শূন্য বিয়েবাড়ির চেহারা। ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে সব ক'টা আলো জ্বলছে। তেতলার ছাদ থেকে সরু সিঁড়ি ধরে কাচঘরে গিয়ে উঠলো তপতী। এখন সুবিনয় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কাচঘরের পেছন দিককার ছোট জানলা দিয়ে নিচে তাকালো। অন্ধকার। ওখানে আম-গাছতলায় সেদিন খানিকক্ষণের জন্য ১৯৫৭ এসেছিল।

তারপর কী ভেবে আলো জ্বেলে নিল। কোনো টাইপরাইটারে চোখ পড়তেই ছোট টুলটা নিয়ে বসে গেল। ঝুল জমেছে। ফিতে প্রায় শুকনো। লেটার ডেস্ক থেকে একখানা পোস্টকার্ড নিয়ে খুট খুট করে টাইপ করতে লেগে গেল।

ক্যালকাটা—ফিফটি-থ্রি
এইট্টিনথ্ ডিস্

ডিয়ার মিস্টার গুহ,

আই রোট ইউ এ লেটার অন ফিফটিনথ্ ডিস্···, হুইচ আই থিংক্ ইউ রিসিভড্ অন সিকস্‌টিনথ্। ইউ ব্যাং মি অন লাস্ট টুইসডে অ্যাট অ্যাবাউট টেন-ও-ক্লক অ্যাট নাইট। প্লিজ রিং মি ওনলি অন উইকডেজ বিটুইন টেন অ্যানড্ ইলেভেন ফিফটিন মিনিটস্ ইন দি মরনিং। রিমেম্বার দিস টাইম।

হোপ ইউ আর কিপিং ওয়েল
ইওরস্ ফেইথফুলি
মৃত্যুঞ্জয় আগরওয়ালা

নিজেই চিঠিখানা ডাকে দিতে বেরিয়ে পড়ল। এখনো রীতিমত অন্ধ-

কার। ভয় ভয় করছিল। তবু সোজা গিয়ে রাস্তা পেরিয়ে লাইটপোস্টে ঝোলানো ডাকবাক্সটার ভেতর চিঠিখানা গলিয়ে দিল তপতী।

ব্যাপার কিছু না। খুব সামান্য। রবির পরম বন্ধু এখন তার ড্রাইভার চন্দ্রা। ক্লাব থেকে বেরিয়েও দেখলো—রাত বিশেষ হয় নি। কোথায় যাওয়া যায়। আজকাল দিনরাতের পার্থক্য বিশেষ বোঝে না রবি। সব খাবারই সমান বিস্বাদ লাগে। গান শুনতে শুনতে বইপড়তে শুরু করে। তারপর একসময় বই এবং গান দু'টিই হারিয়ে ফেলে। রেকর্ড প্লেয়ারটাও একসময় থেমে যায়। তখন রবির মন অন্য কোথায় চলে যায়। প্রথম তিন পেগ অব্দি ঠিক থাকে। তারপর ঢকঢক করে খাওয়ার জন্যে খানিক পরেই এলোমেলো হয়ে যায়।

এরকম একসময় আঠারো বছর বাদে তপতীর বাংলা চিঠিখানা পেল। হাতের লেখা চেনা তাই। নইলে ধরতেই পারতো না—কে এই 'সাধিকা।' মেয়েটা শেষে ধর্মের লাইনে চলে গেল। কি ব্যাপার ? বীথি তো ঠিক বলেছিল। এই আঠারো বছর বাদে ও এখন কেমন দেখতে ? সেরকমই আছে ? পালটে গিয়েছে অনেক নিশ্চয়।

বীথিদের বাড়িতে গিয়ে দু'জনকেই পেল। সাধিকার চিঠির কথা একটাও না বলে শুধু জানতে চাইল, বীথি—একবার কি তোমার দিদির সঙ্গে ফোনেও কথা বলা যায় না ?

তা বলবেন না কেন ? বলে বীথি নম্বরটা দিল।

একটা সময় রবির মনে আছে—যখন লণ্ডন থেকে তপতী লিখেছিল —আমি সুবিনয়কে বিয়ে করছি। আমি আর তুমি যেমন বন্ধু ছিলাম —তেমনই থাকবো।

তখন রবির সময়টা কেটেছে—একদম নিরুপায়ের। লণ্ডনে গিয়ে মুখোমুখি সওয়াল-জবাবের কোনো চান্সই ছিল না সেদিন। চিঠিতে এসবে জোর হয় না। কী নিশপিশ করেছে তখন। সেই তপতী আজ এত বচ্ছর কাছাকাছিই থাকে—কিন্তু ঠিকানা জানে না, ফোন নম্বর জানে না—

তাই কোনো যোগাযোগই হয় নি।

বীথিদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে চন্দ্রা বলল, একটা ভালো জিনিস আছে। খাবেন ?

কি ? দেখি ?

কাঁচা মহুয়া। আমার শালা এনেছে চিল্কা থেকে।

লাল টকটকে জিনিস। একেবারে ফলের কষাটে ভাব জিভে ঠেকে যায়। এক পৌয়ার বেশী খাবেন না একবারে। তেজী জিনিস আছে।

নারে বাবা। বেশী খাব না।

বোতলটা যখন প্রায় তলানিতে—তখন রবি থামলো বিয়ারের বোতলের গলায় গলায় ছিল মহুয়া। চন্দ্রাকে গাড়ি তুলে দিতে বলে রবি যখন বাড়ি ঢুকল—তখন সব ঘর ফাঁকা। সুজাতা বুবুদের স্কুলের গার্জেন সম্মেলনে গেছে। সঙ্গে টুনিও গেছে। কি আর করা। জামাকাপড় ছাড়াব কথা ভুলেই গেল। বেশ ভালো লাগছিল। মহুয়াটা খুব খাঁটি ছিল। প্রথমে ফোন তুলে অফিসে ডায়াল করল।

এখন অফিসে কেউ থাকার কথা নয়। দারোয়ান ধরল। তাকে বলল, গুহ সাহেবকে ডেকে দাও।

ওপাশ থেকে উত্তর এলো, গুহ সাহেব তো ঘর চলে গেছেন।

নিজেই সে রবিরঞ্জন গুহ। তবু কি আশ্চর্য ! সারা অফিসের আর কোনো নাম মনে পড়ল না। রিসিভার নামিয়ে রেখে মনে পড়ল—আরে যাঃ! আজ তো একটা ভালো ফোন নম্বর পেয়েছি।

ডায়াল করতেই লাইন পাওয়া গেল। ওপাশে রিসিভার ধরলো বেশ খানিক পরে। হ্যাঁ। তপতীর গলা। কেমন পাতলা গলা হয়ে গেছে।

হ্যালো।

তোমার চিঠি পেয়েছি সাধিকা।

কে ?

সাধিকা! আমি তোমার সাধু। সাধু রবিরঞ্জন। নাইন্টিন ফিফটি সেভেনের

টোয়েন্টিয়েথ জুন থেকে কথা বলছি। এখন বিকেলবেলা। তুমি ইঞ্জেকশন নিতে যাচ্ছ।

না। না। আমি এখন কথা বলতে পারব না। আমার এখন ধর্মের জীবন। আমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি।

তা তো পড়বেই! আর্লি টু বেড্ অ্যাণ্ড আর্লি টু রাইজ! তোমার চিঠি পেয়েছি তপতী—

ওপাশে লাইন কেটে গেল।

এপাশে রবিরঞ্জন ডানলপ কুশনে বাম্প করে বসে গেল। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৭-এ ফিরে এলো।

ওপাশে সুবিনয় বিছানা থেকেই জানতে চাইল, কার ফোন?

তপতী বলল, রং নাম্বার। তাও কি বলে বোঝানো যায়।

ছেড়ে দিলেই পারতে।

বুড়ো মানুষ। লাইন গুলিয়ে ফেলেছেন। বলতে বলতে তপতী দেখলো নেটের মশারির ভেতর সুবিনয় পাশ ফিরে শুলো।

তপতীর এটুকু বানিয়ে বলতে গলা কাঁপছিল। সবে মশারিতে ঢুকবে এমন সময় আবার ক্রিং ক্রিং।

সুবিনয় উঠতে যাচ্ছিল। তপতীই থামালো। বীথির ফোন নয়ত?

ওপাশ থেকে ভেসে এলো। তপতী মুখার্জী আছেন?

ঘটাং করে নামিয়ে রাখল তপতী। রং নাম্বার।

এর পরে ভয়ে একদম কাঁটা হয়ে সুবিনয়ের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। পাশ ফিরে শোয়া সুবিনয়কে বিয়ের সেই প্রথম দিককার স্টাইলে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল তপতী। এবার ফোন এলে সে কিছুতেই সুবিনয়কে উঠতে দেবে না। জড়িয়ে ধরে রাখবে। বলবে—রং নাম্বার। আরও বলতে পারে—আমার খুব শীত করছে সুবিনয়। একটু শক্ত করে জড়িয়ে ধরো না।

তারপর ইংরেজিতে এই চিঠি। বেলা দশটা থেকে সওয়া এগারোটা—

এই সময়টা সুবিনয় কোর্টে একদম বুঁদ হয়ে থাকে। বাড়ি ফেরার কোনো চান্সই নেই।

ইংরেজিতে টাইপ করা চিঠিখানা পেয়েই রবি সুজাতাকে দেখালো।

সুজাতা বলল, ভালোই হলো। ফোন করলেই ঠিকানা পাবে। তখন যেচে বলবে দেখো। কখন সুবিনয়বাবু বাড়িথাকেন না—তাও চিঠিতে আছে। সে সময়টাতেই ফোন কবতে বলেছে।

তপতীর পোস্টকার্ডখানা এসেছিল রবিব অফিসে বেরোবার মুখে। খাওয়া হয়ে গেছে। জুতো পরছিল—ঠিক সেই সময়ে। তার মুখের হাসি দেখে সুজাতা টিপ্পনি কাটলো। বুঝেছি। সাধিকার চিঠি তো।

তপতী খুব সরল মেয়ে। ওকে অমনভাবে বোলো না। ওর ভেতর কোনো ঘোরপ্যাচ নেই—

না। না। খুব ভালো মেয়ে। সাধে কি তপতীব জন্যে ভেবে ভেবে শরীর ভেঙেছিলে। তারপর তো তাড়াহুড়ায় আমায় বিয়ে কবে বসলে!

পুরো জিনিসটাই তোমার খারাপভাবে দেখা অভ্যেস। বিয়ের পর থেকে তোমার জন্যে কোনো কাজে তো আমি ফাঁকি দিই নি। যে-মেয়ে ভালো —তাকে ভালো বলা যাবে না? কি আশ্চর্য! ওর বাবাকে তো দ্যাখো নি! দেখলে বুঝতে। এই লোকটির জন্যেই—

সব তছনচ হয়ে গেল। নয়ত আমি তো পিকচারেই আসি না!

তাই বলেছি সুজাতা?

বলার দরকার হয় না। তুমি শুধু আমাদের নিয়ে কোনোদিনই সুখী নও। তাই বাইরের লোক ডেকে এনে তোমাকে আনন্দ করতে হয়।

তাই বুঝি! বন্ধুদের লোক বাড়িতে ডাকে না?

তাই না? মনে করে গ্যাখো। আজ পর্যন্ত যতবার আমি তুমি বাইরে বেরিয়েছি—ফিরেছি ঝগড়া করতে করতে।

সে তোমার বোকামির জন্যে সুজাতা।

তাই হবে। আমি ওঘরে যাচ্ছি। নাও ফোন করে নাও। এখন সময়

হয়েছে।

ছেলেমানুষি কোরো না। তোমার সামনেই করছি। তুমি যে তপতীকে হিংসে কর—তা দেখতে আমার খুব ভালো লাগছে।

সুজাতা ঘর থেকে বেরোতে পারল না।

ডায়াল করে লাইন পেয়েই রবি বলল, মৃত্যুঞ্জয় আগরওয়ালা হ্যায় ?

ওপাশ থেকে কাচভাঙা হাসি। আছি। এ সময় ছাড়া অন্য সময় ফোন কোরো না। বীথিদের বাড়ি গিয়ে আমার জন্যে হা-হুতাশ না করে সোজা ফোন করলেই পারতে।

নম্বর জানতুম না যে—

তুমি কি যোধপুর পার্কে থাকো ? আর গুহ নাম দেখে তিনদিন ফোন করেছি। এক হিন্দুস্থানী ধরে।

না। না। আমি তো লেক গার্ডেনসে থাকি।

ওঃ ! আমি অন্যরকম শুনেছিলাম।

রবি কথা বলছিল আর সুজাতার মুখ দেখে আনন্দ পাচ্ছিল। ওদিককার কোনো কথা শুনতে না পেয়ে ক্রমেই ওর মুখ মেঘ করে আসছিল।

তখন তপতী ওধার থেকে বলে যাচ্ছিল, বছর দশেক আগে—এদিকে বর্ষাকালে একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছে। তখন আমরা দোতলায় থাকি। ঝুল-বারান্দা থেকে দেখলাম—তুমি জল ভেঙে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছ।

রবির পরিষ্কার মনে আছে—সে কলকাতায় কোনোদিন সাইকেল চালায় নি। তবু বলল, হ্যাঁ। তখন তো খুব চড়তাম। আমার গিন্নীর সঙ্গে কথা বলবে ?

এপাশে সুজাতা মুখ ঘুরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওপাশে তপতী বলল, এখনো সময় হয় নি। গুরুদেবের ইচ্ছে হলেই দেখা হবে।

ঘর ফাঁকা পেয়ে রবি নিচুগলায় বলল, এখন সব তোমার কাছে ? কত-কাল দেখি নি।

আমাকে দেখার কিছু নেই। দেখলে দুঃখ পাবে। চলে এসো।

ঠিকানাটা ?

তপতী বলল। তারপর বলল, বাস স্টপ থেকে ডান হাতে তিনটে ক্রসিং পেরিয়ে বাঁয়ের সেকেণ্ড বাড়ি। ক্রিম রঙের—গাড়িতে এসো না কিন্তু। গাড়ি মোড়ে রেখে হেঁটে আসতে পার।

ফোন নামিয়ে ঘড়ি দেখলো রবি। আরও ছাপ্পান্ন মিনিট সময় আছে হাতে। সুজাতা বড় বালতিতে সার্ফের ফেনা করেছে। এখন তাতে ব্লাউজ, পাজামা, টুনির ফ্রক, বুবুর গেঞ্জি ভেজাবে।

চন্দ্রা এসেছে ?

অনেকক্ষণ।

তাহলে অফিসে বেরিয়ে পড়ি।

তা কেন ? এতদিন পরে কথা হল। একবার দেখে তবে অফিসে যাও।

আজ তো সময় হবে না সুজাতা। আরেকদিন যাব। তোমায় নিয়ে।

আমি আবার এর ভেতরে কেন।

গাড়িতে বসে চন্দ্রাকে তপতীদের বাড়ির দিকেই যেতে বলল। মোড়ে গাড়ি রেখে বাড়ি খুঁজে বের করতে বেশী সময় লাগল না।

নিচে গ্যারেজ। বড় বৈঠকখানা। তার গা দিয়ে ফ্ল্যাট। বোঝাই যায় —ভাড়াটে বসানো। ফোনের কথামতো রবি গিয়ে কলিংবেল টিপলো। একটি ফুটফুটে মেয়ে এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো। পরনে লুঙি। ওপরে ফ্রক। চোখে কাজল। কপালে চন্দনের টিপ। হাতে তুলি। কিছু আঁকতে আঁকতে উঠে এসে থাকবে।

ওপরে চলুন।

আমাকে চেনো তুমি ?

মায়ের কাছে শুনেছি।

সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে রবি বলল, কি শুনেছো।

সব শুনেছি। মা আমায় সব বলে।

তুমি তো এখনো ছোট। সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল আর দেওয়ালের এক

একখানা ছবি দেখছিল রবি। গুরুদেবের ছবি। এ-ছবি ভক্ত না হয়েও অনেকে চেনে। চোখে পড়ে। নানা বয়সের ছবি। সমাধির সময়কার। সাধনার দিনের। দেহাবসানের।

সিঁড়ির গোড়ায় ১৯৫৭ সালের ২০শে জুন দাঁড়িয়েছিল। হাসিমুখে। এসো। ওপরে এসো।

বুকটা ধক করে উঠলো রবির। কিন্তু মুখের ভাবটা তপতীর চেয়েও তার মেয়ের সামনে আগে লুকোনো দরকার। তাই বলে উঠলো, তোমার মেয়ে তো ভারী সুন্দরী।

ওঃ! এষা। ওর কথা আর বোলো না। জন্ম থেকে ও-ই আমার একমাত্র বন্ধু। ওকে আমি সব বলি। গতজন্মে কোনো পরিণত মানুষ ছিল।

বসতে বসতে রবি বলল, গতজন্মে বিশ্বাস কর?

তা করি বইকি। এক জন্মের সংস্কার আরেক জন্মে চলে আসে। সবার সবকিছু আগে থেকে ঠিক হয়ে থাকে। নয়তো তোমার সঙ্গে আবার এত-দিন পরে দেখা হবে কেন। হয়তো গুরুদেবের তেমন ইচ্ছে আছে। গুরু-দেবের ইচ্ছেতেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। তাই বলবে তো।

এষা দূরে বসে কী আঁকছিল। এগিয়ে এসে বলল, আমি কফি করে এনে দেব?

এতটুকু মেয়ে পারবে?

তপতী বলল, আমাদের নিজের কাজ সব করতে হয়। পারবে না কেন? তারপর মেয়েকে বলল, নিয়ে এসো। সঙ্গে বিস্কুট দিও। এবারে তপতী বড় করে তাকালো রবির দিকে। খানিক চুপ করে থাকায় রবি এতদিন পরে সেই চোখ আবার দেখতে পেল। এতক্ষণ ওর গলার স্বর রবির মাথার ভেতর গড়িয়ে যাচ্ছিল। বসার ভঙ্গিটা পর্যন্ত চেনা। এমনকি বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে সেই কালশিটের দাগটা।

তপতী তখন বলছিল, ভবিতব্য তাই ছিল হয়তো।

এসব কথা এখন অর্থহীন। তা ভালো করেই জানে রবি। তাই বিশেষ

কিছুই তার কানে যাচ্ছিল না। তার কাছে এখন পুরো দৃশ্যটাই অবিশ্বাস্য। সেদিনকার তপতী। তার ছবি আঁকিয়ে বছর এগারোর মেয়ে। সে আবার মায়ের সখী। সবই জানে। অথচ কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। সুবিনয়বাবু বাড়ি নেই। মাঝখানে শুধু এই গুরুদেব ব্যাপারটাই নতুন। সেদিন ইনি ছিলেন না।

বাবা কোথায় ?

তিনি তো পাঠকপাড়ায় পুরানো বাড়িতে শিবমন্দির করে আছেন। শিব-সাধক।

তোমাদের বংশটাই ধর্মের লাইনের ! মনে মনে কিন্তু রবি নিজেকে বলল, কি ব্যাপার ? সবাই এত সাধু হয়ে যাচ্ছে কেন ? কি হল ?

তুমি আমাদের নিউ আলিপুরের বাড়ি তো দ্যাখো নি। বাবা পাকিস্তানের পাট চুকিয়ে দিয়ে ওখানে যে বাড়ি করেছিলেন—

মনে পড়ল রবির। লণ্ডন থেকে তপতী লিখেছিল—আয়ুব খাঁ পাওয়ারে চলে আসায় বাবাকে ঢাকায় ওষুধের ব্যবসা ছাড়তে হয়েছে। অনেক কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে ইণ্ডিয়ার বর্ডার ক্রস করে ঢুকেছেন। এখন আমাদের খারাপ সময়। বীথির ডাক্তারি পড়া শেষ হয় নি। আমি বিদেশে। বাবা যে এই অবস্থায় কী করে নিউ আলিপুরে বাড়ি করবেন বুঝতে পারছি না একদম। আমাদের তো মাথায় আসছে না কিছুই।

দেখেছি। তৈরি হতে দেখেছি।

কী করে দেখলে ?

তারাতলায় কৃষিমেলা ওপেন করতে এলেন প্রেসিডেন্ট রাধাকৃষ্ণণ। আমাদের ফার্মের কিছু মেসিন ছিল ফেয়ারে। আমায় যেতে হতো ও পথ দিয়ে। বিরাট বাড়ি।

কেউ থাকে না এখন। একটা ফ্লোরে বীথিদের নার্সিং হোম। একতলায় গণেশের হোটেল—

গণেশ ?

আমাদের একমাত্র ভাই। ও তো বি. এস. সি. পাস করে হোটেল করেছে।
নিজে অবশ্য এক পয়সাও নেয় না। তন্ত্রসাধনায় আছে—
তোমরা সবাই ধর্মে চ'লে গেলে।
গুরুদেবের ইচ্ছে। বাড়িটা ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে তুলে দিতে হল।
সি আই টি ?
হেসে ফেলল তপতী। তা কেন? আমরাই ট্রাস্টি। আমি, বাবা, গণেশ, মা—
বীথিকে নাওনি ?
ও তো কিছুই বিশ্বাস করে না।
দলছুট ?
ও কথা বলছো কেন ?
এমনি। আচ্ছা তপতী—তোমাদের সবার এমন ধর্মে মতি হল কি করে?
বোধহয় আমাদের রক্তে ছিল। দ্যাখো না—মা পর্যন্ত পুজো-আচ্চা নিয়ে আছেন। সেই পাঠকপাড়ার বাড়িতে। সে বাড়ি তো চিনতে তুমি।
রবির আবছামতো মনে আছে। একদিন সন্ধ্যেবেলা লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে তপতী বলেছিল, চল আমাদের বাড়ি যাই।
তোমার বাবা নেই এখানে ?
বাবা তো ঢাকায় এখন।
বোধহয় শীতকালের মুখে মুখে। সন্ধ্যেবেলা। বাড়ির সামনে একটা অস্পষ্ট পুকুর। ঘরের ভেতর থেকে তপতীর মা প্রথম কথা বলেছিল, তপু আজও তোর বাবার চিঠি এলো না।
সেই সন্ধ্যার এক টুকরো ছবি তেকোনা ভাঙা কাচ হয়ে আজও রবির মনে বিঁধে আছে।
রবি বুঝতে পারছিল, কাল রাতে তপতীর সঙ্গে দেখা হলে অনেক ভালো হতো। তখন তার পেটে মহুয়া ছিল। সে সহজেই অনেক কথা বলতে পারত। এখন সে-সব কথা মুখে আটকে যাচ্ছে। যেমন—মাত্র পনের

ষোল বছরে তোমরা দু'জনে ধর্মের জীবন কাটিয়েও কী করে এত সুন্দর এত বড় বাড়ি করলে ? কী করেই বা বীথি আর সনৎ হিন্দী ছবির হিরোইনের বাড়ির মতো অত বড় বাড়ি করল? সবটাই ধর্মের জীবন? ভাতের হোটেল আব তন্ত্রসাধনা একই সঙ্গে চলে? ওষুধের ব্যবসার পর শিবসাধনা ? তা হয় নাকি ! অত বড় বাড়ির ট্রাস্টি নিজেরাই !

এষা এখানে এসে বোস্।

তোমার মেয়ে থাকলে আমি আড়ষ্ট হয়ে যাই তপতী।

ও তো আমার সখী রবি। এ পাঁচ ছ'বছর বয়স থেকেই ভিসন দেখে। ধ্যান করে। ভিসন এঁকে রাখে খাতায়। ওতে তোমার লজ্জা করার কোনো কারণ নেই।

এষা অবশ্য এলো না। ও নিজের মনেই খুটখাট করে যাচ্ছিল। যতই ভিসন দেখুক—হাজার হোক বালিকা তো।

তোমার শরীর কেমন আছে ?

এ কথায় তপতী জ্বলে গেল। আবাব সেই শরীর? ভ্রূ কুঁচকে গিয়ে থাকবে? তাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নিজের মুখখানা স্নিগ্ধ করে তোলার চেষ্টা করল তপতী। সবাই বলে আমি খুব রোগা হয়ে যাচ্ছি। সবাই বলে আমার খুব মানসিক অশান্তি। চুয়াত্তরে গুরুদেবের আশ্রমে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে এসে এক বছর নিরামিষ খেয়েছি। তারপরেই রোগা হতে শুরু করি। তাছাড়া আবার ব্রহ্মচর্য পালন করছি। তবে আমার ওজন কিছু কমে নি। আজকাল আমার কোনোকিছু খেতে ভালো লাগে না। জোর করে খেতে হয়। গুরুদেবও খুব কম খেতেন। তাঁর শরীরও পরে খুব ক্ষীণ হয়েছিল। তুমি জানো না রবি—বলা হয়, যারা ধারণ করতে পারে—যোগসাধনার সময় তাদের ওপর আলো নামলে দেহে পরিবর্তন হতে থাকে—

এ কোন্ তপতী কথা বলছে। অনেকদিনের হারানো রাগ, ক্ষোভ একসঙ্গে ফেটে পড়বে এই ভয়ে রবি শুরু থেকেই একদম চুপচাপ ছিল।

এখন তপতীকে দেখে সে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল।
আমার মানসিক অশান্তি না থাকলেও তোমার জন্যে কিছুটা চিন্তা আছে। শুনি খুব ড্রিংক কর। আমার কথা বল। আমি কি এমন জিনিস! একটা মেয়ে বইতো নয়। গুরুদেবকে ধ্যানে বলেছিলাম, রবির দুঃখের বোঝা আমাকে দিয়ে দাও। ওকে মুক্ত কর। ওর পরিবারকে মুক্ত কব। আমার বিশ্বাস আমি দিব্যদৃষ্টিতে গুরুদেবকে দেখতে পেয়ে এপথে যখন এসেছি—তখন আমার কিছুটা যোগশক্তি আছে। আমি দৈবস্বার্থে তোমার বোঝা নিতে পারব। কারও বোঝা নিলে মাঝে মাঝে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তবে আমি তাতে ভয় পাই না। আমাকে করতেই হবে। কারণ, আমি পরে ভেতর থেকে বুঝতে পেরেছি—তোমার সঙ্গে আমার আগের জন্মের যোগ আছে। যেদিন জানবো—তুমি সুস্থ জীবন যাপন করছো—সেদিন আমি থামবো—তার আগে নয়।
কতকাল তপতীকে দেখে নি রবি। একবার চোখের দেখা দেখতে এই আসা। তার সঙ্গে ছিল কিছু হারিয়ে যাওয়া ক্ষোভের কথা। যে কথার আজ আর কোনো মানে হয় না। সময় সব ওলটপালট করে দিয়ে গিয়েছে। যেমন, এত ভালোবাসাবাসির পর তুমি সেদিন আমায় আচমকা বন্ধ করে দিলে কেন? তুমি তো সেই অর্থে নিরুপায় বা অবলা নয়—তুমি সেদিন কেন বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রবিরঞ্জন গুহকে বিয়ে করলে না? তোমার ফাঁক ছিল কোথাও? তুমি পরিষ্কার ছিলে না।
কিন্তু এসব কোনো কথাই রবির মুখে এলো না। সেই তপতী—আজ এই তপতী—এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই রবি হারিয়ে গেল। একসঙ্গে ভিড় করে অনেক কথাই আসছিল। কিন্তু এখনকার তপতী—কথায় কথায় তার বড় হয়ে ওঠা চোখ রবিকে এক ধাক্কায় রবির ভেতরে পাঠিয়ে দিচ্ছিল।
তবে গুরু কৃপা করলেই সব হবে। তাছাড়া নয়। আমি সূক্ষ্ম জগতের অনেক দৃশ্য চোখ বুজলেই দেখি। সব সময় ভেতর থেকে কে যেন বলে

—তুমি মাতৃশক্তি—তুমি সকলেব মধ্যে যাও তবে গুরুদেবের কাজ ভালো হবে—দলাদলি কমবে, ঐক্য আসবে। এজন্যেই আমাকে যেতে হচ্ছে, সবার সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে। এতে অনেকে কানাঘুষো করছে বটে, তবে আমি জানি আমি নিরাসক্ত, সবাইকে—ছেলেমেয়ে নির্বি-শেষে আমি গুরুদেবের সন্তান বলেই ভাবি।

রবি যত না অবাক হচ্ছিল এখন—তার চেয়ে বেশী পাচ্ছিল দুঃখ। হল কি তপতীর। এমন বেভুল বকছে কেন? ধর্মের বয়স কি আমাদের এসে গেল। এখনো তো তপতীর একটা চুলও পাকে নি। এ কোন্ পথে চলে গেছে তপতী।

তখন তপতী বলছিল, তোমার ব্যাপারে প্রাণের একটু গোলমাল আছে। তবে আমি সেটাও শুদ্ধ কবে নিতে চাইছি। গুরু বলেছেন, জোর করে দমন কোরো না। রূপান্তর ঘটাও।

ফাঁকা বাড়ি। চল্লিশের যাত্রিণী তপতী আর হয়ত তিন চাব বছর পরেই চল্লিশ পেরোবে। একদম গীতা চণ্ডী নিয়ে ক্লাস নিচ্ছে যেন। রবি হাঁফিয়ে উঠেছিল। একটা কথায় চমকে গেল।

তপতী বলছিল, উকিলবাবুর তোমার উপর বিদ্বেষ কমে গেছে।

রবি আপত্তি করে উঠলো। বিদ্বেষ কেন থাকবে? আমি তো তাঁর কোনো ক্ষতি করি নি।

তোমার দোষ—তুমি তাঁর ভবিষ্যতের বউকে ভালোবেসেছিল। এখন ওর সামনে তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমাকে অভিনয় করতে হবে। আমি সেটা চাইছি না। কোনো উৎসবে গুরুভবনে যদি তুমি বা তোমার কোনো আত্মীয় যাও আর আমাকে দেখতে পাও—তবে নিশ্চয় কথা বলবে, তাতে কারো কোনো আপত্তি হবে না। এখন থেকে ভাববো তুমি আমার আগেকার বন্ধু নও—এখনকার বন্ধু। আগামীকালের বন্ধু। আগেকার যা কিছু সুন্দর, তা মনে রাখতেই হবে। অসুন্দরকে ভুলতে হবে।

তাহলে আমাকে ভুলে যাও তপতী। আমি খুব সাধারণ। আমি শুধু তোমাকে ভালোবেসেছিলাম।

তুমি তো আজও আমাকে ভালবাসো। তাই না রবি?

এতটা আত্মবিশ্বাস ভালো নয় তপতী। বলেই খেয়াল হল—তপতী বড় নরম মেয়ে। ওকে এভাবে কথা বলা পুরুষোচিত হচ্ছে না। তাই মুখে একখানা হাসি ফুটিয়ে চুপ করে বসে থাকল রবি। সত্যি বলতে কি তপতী আর সেই তপতী নেই। এখন একদম ধর্মক্ষেপী। আর আজ সে কিছুতেই আগেকার রবি নেই। এখন জীবনের অনেকটাই বুবু। অনেকটাই টুনি। আশ্চর্য! এই রমণীর চিন্তা তাকে একদা কাহিল করেছিল। এখন তো কিছুই মনে হচ্ছে না।

মনের চেয়ে স্পীডে ছোটে এমন কোনো এরোপ্লেন নেই। আলোর গতিতে রবি ভেবে নিচ্ছিল, আমারও তো আজকাল কিছু খেতে ভালো লাগে না। আমিও তো প্রায় ব্রহ্মচারী। ক'দিনই বা সুজাতা আর আমি আগেকার মতো রাত ফুরিয়ে গেল বলে আপসোস করি। এটাই বোধহয় নিয়ম। কয়েক বছর হলো জ্যাঠামশায়, কাকাবাবু, মেসোমশায় হয়ে বসে আছি। দাড়ির দানা কামাতে ভীষণ বেগ পেতে হয়। এই সময়টা কি ধর্মে যাবার সময়। আর বড়জোর দশ বারো বছর হইচই করার টাইম পাওয়া যাবে।

এসো তোমায় ধ্যান শিখিয়ে দি।

আমি? আমি তো কোনোদিন ধ্যান করি নি।

শিখলেই পারবে। গুরুদেবের যোগে কোনো গুরু নেই। নিজের আত্মাই গুরু।

তপতী বলতে বলতে শতরঞ্জি পেতে ফেলল। ধুপ ধরিয়ে দিল গুরুর ছবির সামনে। তারপর চোখ বুজে নিজে পদ্মাসনে বসে পড়ল। ইঙ্গিতে রবিকে পাশে বসতে বলল। এমন যে একদিন বসতে হবে রবি তা

স্বপ্নেও ভাবে নি কোনোদিন। এর আগে ওরা যা পাশাপাশি বসেছে—সে তো অনেক আগে। একদিন চিড়িয়াখানায় হাতির পিঠে। একদিন জলের ধারে। আরেকদিন লাইব্রেরির মাঠে। একবার বোধহয় গঙ্গায় ভাসন্ত সেই রেস্তোরাঁর ডেকে। এক বছর বান এসে গঙ্গার সেই রেস্তো-রাঁর ডেক ছিঁড়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ওখানে দাঁড়িয়েই একদিন বিকেলে তপতী গেয়েছিল, তোমার পথের থেকে আমার পথ যে গেছে বেঁকে—

পাশে বসে রবি বলল, তুমি আজকাল গাও না তপতী?

চুপ। এখন কোনো কথা নয়। মনস্থির করো। সিধে বসে তু'খানা হাত বুকের কাছে নাও। এবার তোমার নিজের তুই ভ্রূর মাঝখানের আজ্ঞা-চক্রকে স্মরণ কর।

এই মেয়েটিই রবিকে নিয়ে একদিন অস্থির অবস্থায় কালীঘাটে গিয়ে-ছিল। বলেছিল, এসো আজ আমাদের মালা বদলের বিয়ে হয়ে যাক। ঠাকুর সাক্ষী।

সেদিন রবি বলেছিল, মনস্থির করো তপতী। আজ সেই তপতীর অনেক ভাষাই রবির কাছে বিদেশী লাগছে। সোজা হয়ে বসে চোখ বুজলো। তু'খানা হাতের পাতা গাছের পাতা করে বুকে লাগালো। চোখ বুজে রবি কিছুতেই আজ্ঞাচক্রের সন্ধান পেল না। একবার আড় চোখে দেখতে পেল, তপতী নিশ্চল হয়ে বসে আছে। একদম নিষ্কম্প দীপশিখা।

ওঁ আনন্দময় চৈতন্যময় সত্যময় পরম্। বেশ কেটে কেটে বলল তপতী। তু'বার। তারপর শতরঞ্জি গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল। ভাবখানা মিশনারির। এষা তখন কফির কাপ এনে রাখলো তু'জনের সামনেই।

ক'খানা বই দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। গুরুদেবের কথা। বাড়ি নিয়ে গিয়ে পড়বে। গুরুদেবের যা-কিছু নির্দেশ তা সবই বইয়ে পাবে। বই পড়ে নিজের সুবিধামতো সময়ে ধ্যান শুরু করতে হবে। তারপর ভেতর থেকেই সব নির্দেশ আসবে। চক্রে মন নিবিষ্ট করতে কষ্ট হলে কোনো

চেয়ারে রিলাক্স করে বসে ওঁ মন্ত্র জপ করলেও চলে। প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে এ জপ চলবে। খুব ভোরে ওঠার কথা অনেকে বলেন। তবে আমার শরীরে সেটা সয় নি বলে আমি আজকাল শোবার আগে বা অন্য সময় গুরুদেবকে স্মরণ করি। তাতে স্বপ্নও বেশী দেখি না—দেখলেও দিব্য কিছু দেখি। এই দিব্যজীবনের সন্ধানে বইটা পড়ে দেখো। সব পাবে। বাবা তো আমাদের হৃদ্‌গুহাতেই আছেন। তিনি সব নির্দেশ দেবেন। আমাদের নিম্নপ্রকৃতির পরিবর্তন অতি অবশ্যই করতে হবে। গুরুদেবের আলো অন্ধকারে নামে না। তোমার মধ্যে অসম্ভব শক্তি রয়েছে। আমি দেখেছি। তুমি নিশ্চয়ই পারবে। সব রকম নেশা আস্তে আস্তে কমাতে হবে। যতদূর সম্ভব ব্রহ্মচর্যও পালন করতে হবে। সদ্‌-গুরু ছাড়া দীক্ষা নেওয়া একদম উচিত নয়। সদ্‌গুরু মানে যার ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়েছে। এ রকম লোক চট করে পাবে না। অতএব আত্মাকে গুরু কর। সেদিন লাইব্রেরিতে যাওয়াটাই আমাদের দু'জনের ভাগ্য বা কর্মফল। এসব নিয়ে আর দুঃখ কোরো না। সুখদুঃখ সবই চৈত্য-পুরুষের অভিজ্ঞতার জন্য। তোমাকে আমার এত কথা বলতে ইচ্ছে করে যাতে একটা বিরাট বই হয়ে যায়। ধ্যান করলে যে পার্থিব খুব উন্নতি হবে তা নয়। অনেকে বলেন, ধ্যান করে আমি কি বা পেলাম! যারা আন্তরিক—তারা অনেক কিছু দিব্যবস্তু পায়। তুমি নিজেই জানবে। শুধু গুরুর কাছেই তোমার বুকের কথা স্বীকার করবে। আর কারো কাছে নয়। যদি সাধক না হতে পার—ধর্মকে জীবনের অঙ্গ কর! জীবিত মানুষকে নিয়ে ধ্যান কোরো না। তোমার মৃত মায়ের কথা ধ্যান করতে পার। 'পিতৃলোক' থেকে তাঁর সাহায্য চাও। তোমার সঙ্গে যে কত কথা বলতে ইচ্ছে করে। কথাগুলো যদি আধ্যা-ত্মিক হয়—তবে সবচেয়ে ভালো। তুমি একদা আমায় ভগবান বলে-ছিলে। ভগবানের সঙ্গে এমনিতে তো মেলামেশা হয় না।

বলেছিলাম বুঝি। আজ মনে পড়ছে না।

তপতী নিজেব কথায় এতই ডুবে ছিল যে, ববিব এই কঠিন কথাটাও তাব কানে গেল না।
রবি এবার বলল, কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তুমি ওখানটায় বসে একটু জিরিয়ে নাও। নিজেব মনে মনে বলল, সময়েব নিয়মে তপতী আর সে বকম নেই। চোখেব সেই স্নিগ্ধ চমক কোথায় গেল! কোথায় গেল, বড় বড় চোখ করে আচমকা হেসে ওঠা? তাব ওপব আবাব ধর্মাধর্মেব টানাপোড়েন, অযত্ন তো আছেই। মেয়েটা এমনিতেই আগে থেকে অগোছালো ছিল। তারপব সরল। নরম।

৯

চিড়িয়াখানার দরজা খোলা পেয়ে ওরা দু'জনে ঢুকে পড়ল। একটা নতুন মোটরগাড়ি বেরিয়েছে বছরখানেক। কলকাতার রাস্তা একদম ছেয়ে ফেলেছে। ল্যাণ্ডমাস্টার। তাবই একটা ট্যাক্সিতে ববি আব তপতী এসে একটু আগে নেমেছে। রবির সন্দেহ হচ্ছিল, আজ বোধহয় চিড়িয়াখানা বন্ধ। একটা লোকও নেই। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে বুঝলো—সত্যিই আজ ছুটি। একজনও দর্শক নেই। দরোয়ান নেই।
ওরা দু'জনে ট্যাক্সি করে ময়দানের পাশ দিয়ে এইমাত্র এসেছে। রবি চুমু খেতে ঝুঁকে পড়তেই—প্রায় বিকেলের ক্যাস্থুরিনা অ্যাভিন্যু দিয়ে সর্দারজী ভীষণ জোরে গাড়ি চালিয়েছে। তার ঝাঁকুনি এখনো গায়ে লেগে আছে।
তপতী বলছিল, আমায় চুমু খেতে তোমার কেমন লাগে।
তোমার?
জানি না। তোমাবটা বল না?
আমি ডুবে যাচ্ছিলাম।

আহা। সবটাতেই বাড়াবাড়ি। ক'দিন পরেই তো লণ্ডনে চলে যাব।
তখন কি করবে ?
লণ্ডনে চলে যাব।
পাসপোর্ট ?
করে ফেলব।
টিকিট ?
সে একটা কিছু হয়ে যাবে। তারপর গম্ভীর হয়ে রবি বলল, আমি এখন কোত্থেকে যাব ! টিউশ্যানিগুলোও তোমার পাল্লায় পড়ে হারিয়েছি। সেলসম্যানের চাকরি তোমার বাবার পছন্দ নয়। তোমার কি নিজের কোনো পছন্দ নেই ?
ওরা দু'জন হনুমানদের খাঁচাগুলো পেরিয়ে গেল। তখনো কোনো লোক চোখে পড়ল না। তপতী জানে, তার বিদেশে যাওয়া যতই এগিয়ে আসছে—ওদের দু'জনের ঘুরে বেড়াবার বিকেল, সন্ধ্যে—ততই কালো হয়ে আসছে। কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না তপতা। সামনে তাকিয়ে অবাক্।
একটু দূরেই খাঁচায় বাঘ। তাকে সাত আটজন মিলে দেখছে। আরে ! ওই তো দীলিপকুমার। দেখছো রবি। বৈজয়ন্তীমালাও রয়েছে। হয়ত কোনো ছবি রিলিজের জন্যে কলকাতায় এসেছে। এবার আমাদের দেখলে তো চিড়িয়াখানার লোক তাড়িয়ে দেবে। ছুটির দিন দেখেই দিলীকুমারকে বাঘ দেখাতে এনেছে।
চল পালাই।
এখন পেছন ফিরলে ধরে ফেলবে। তার চেয়ে এসো—আমরা এমন ভাব দেখাই—যেন, আমরাও ওদেরই দলের লোক।
রবির কথায় তপতী আপত্তি করলো। আমাকে দেখতে সুবিধের নয়। ঠিক বুঝে ফেলবে।
তুমি ঠিক চলে যাবে। বৈজয়ন্তীর প্রাইভেট সেক্রেটারি বলে ধরে নেবে

চিড়িয়াখানার লোকজন। ওই তিনজন বোধহয়—চিড়িয়াখানার লোক। কেমন বাঘ দেখাচ্ছে গ্যাখো!
'নয়া দৌড়' ছবিটা মুক্তি পাবে। কাগজে ওদের আসবার কথা লিখেছে।
রবি তপতীর এ কথা কানেও তুললো না। আসলে দ্যাখো—ওরা বাঘ দেখাতে গিয়ে ক্লোজ রেঞ্জে দিলীপ-বৈজয়ন্তী দেখে নিচ্ছে। কিন্তু জানে না—দিলীপ-বৈজয়ন্তীর এসব ভালো লাগছে না।
কেন?
বাঃ! ভালো লাগবে কি করে? নির্জন চিড়িয়াখানার বাঘ ভালুক তো ওদের চিনতে পারবে না। ওরা চায়—ওদের ফ্যান পাগলের মতো ওদের দেখতে ছুটে আসুক। পুলিশ লাঠি চালাক। হৈ চৈ কাণ্ড বেধে যাক। তা নয়তো মজা কোথায়!
তাই বুঝি! আমার কিন্তু একটা জিনিস খুব খারাপ লাগছে। এই ক'-দিনে আমি তোমার চোখে হিরোইন হয়ে উঠেছি—
আমি হিরো!
থামো বলছি। এই অবস্থায় আরেকজন হিরোইন—যে-কিনা আমার চেয়ে বেশী ইম্পর্টান্ট—এটা আমার আদৌ ভালো লাগছে না।
আমারও কি ভালো লাগছে তপতী। চৌরঙ্গীতে বসার জায়গা না পেয়ে চিড়িয়াখানায় এসে একি ফেরে পড়ে গেলাম বল তো। চলো তো—জলের ধারে গিয়ে বসি।
শেষে যদি গেট আটকে লোকজন চলে যায়—তখন আমরা বেরোবো কি করে?
অল্পক্ষণ বসবো জলের ধারে।
জলের কিনারায় লম্বা ঠোঁটের দুটি বড় পাখি নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ওরা গিয়ে বসতেই বিরাট পাখা মেলে পাখি দুটো উড়ে গেল। পাখার ঝাপটায় অনেকটা বাতাস দুজনেরই মুখে এসে লাগল। তপতী চোখের চশমাটা খুলে কাচ মুছছিল। সেই সময় রবি দেখতে পেলো—ডান

চোখের ভেতর দিয়ে চমকানো বিদ্যুতের ধারায় একটা লালচে দাগ মণি অব্দি চলে গেছে।

চোখে ব্যথা পেলে কখন ?

তপতী লুকোতে পারল না। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি—পাঁচটাও বাজে নি আমাদের ওদিকটায় সূর্য আগে ওঠে বোধহয়। তারপর থেমে গেল তপতী। কী ভেবে আবার বলতে শুরু করল। আমি ভুলেও দেখে থাকতে পারি। মা পঞ্চাননতলায় ফুল দিতে গেছে বাবারই কল্যাণে। আর বাবা—

আপনা আপনিই বলতে লাগল তপতী। বাবা ছোটমাসীর ঘর থেকে বেরোচ্ছেন। ক'দিন হল ঢাকা থেকে ফিরেছেন। হাজার হোক আমি মেয়ে। ছোটমাসী একছুটে বাথরুমে চলে গেল। তখনো বোধহয় ভালো করে আলো ফোটে নি। আমি লজ্জায় ঘেন্নায় সরে আসছি—এমন সময় কাপড় মেলার তারে ঝোলানো শক্ত খড়খড়ে তোয়ালেতে চোখের কোনাটা ঘেঁষটে গেল।

নির্জন চিড়িয়াখানায় এ কথাগুলো একসঙ্গে আরও অনেক বেশী নির্জনতা এনে দিল। জলের ওপারেই দূরের মাটিতে দুটো ময়ূর টিকিট-চেকার হয়ে একবার ঘাসে ঠোঁট গুঁজে কি তুলে নিচ্ছে—আর কয়েক-পা গলা তুলে হেঁটে নিয়ে আবার একবার করে ঘাসে ঠোঁট গুঁজেই মুখ তুলে নিচ্ছে। রবি কোনো কথা বলতে পারল না। আর এক মাসও নেই—তপতীর লণ্ডন পাড়ি দেবার। কয়েক ঘণ্টায় লণ্ডন উড়ে যাবে। যাবে কারণ, তো হয় নি—বসে থেকে কি করবে ? তাই একটা কিছু পড়তে এই বিদেশ পাড়ি। এটা ওর বাবারই ইচ্ছে। সেই বাবাকে ভোর-বেলায় তপতী ওভাবে দেখেছে।

তাই জানো। মা বলেন, কোনো সুন্দর মুখের মানুষকে কখনো বিয়ে করিস নে। তার চেয়ে অসুন্দর অনেক ভালো। মানে চলতি অর্থে যাদের আমরা সুন্দর বলি। মা যে কেন আগে ওকথা বলতেন, তা

আজ আর আমার কাছে আবছা নয়।

রবি বলল, আমার কথায় রাগ কোরো না। তোমরা আগে তো গরিব ছিলে—

জলের দিকে তাকিয়ে তপতী বলল, বলতে পারো সুখে ছিলাম।

তোমরা এখন বড়লোক হয়ে উঠছো।

বাবা তো বলেন, সংসারের হাল ফেরাচ্ছেন। আমি বলব —আমরা অসুখে পড়েছি।

ওদের কথা আর এগোলো না। চিড়িয়াখানার লোকজন ওদের দিকে তাকাচ্ছে বলে ওরা উঠে পড়ল।

উঠে গিয়ে রবির মনে হল, এখুনি দিলীপকুমারের ভিড়ে মিশে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো। নয়ত ওদের সহজেই ধরে ফেলবে। তখন দেখেছিল —মোটমাট দশ বারোজনের ভিড়। এখন সেটা অন্তত পঞ্চাশজনে ঠেকেছে।

গোটা সাতেক হাতি সাজিয়ে চিড়িয়াখানা তৈরি। প্রথমটায় দিলীপ তার পরেরটায় বৈজয়ন্তী, তার পরেরটায় আরও কে—এমনি করে গোটা ছয়েক হাতি চলতে শুরু করলে শেষেরটাব মাহুত রবি আর তপতীকেও ডাকলো। ওদের ভেবেছে—এ দলেরই লোক।

অগত্যা।

পিছিয়ে পড়া একেবারে শেষের হাতির পিঠে চড়ে রবি বলল, ভাবখানা দেখাও—আমরা যেন এ-দলেরই লোক।

সেটা আমার খারাপ লাগছে। চল আমরা নেমে পড়ি রবি।

এখন নামবে কোথায়! সারা চিড়িয়াখানা দেখাচ্ছে যে—

জানা জায়গায় এমন অচেনা অতিথি হয়ে ঘুরতে কার ভালো লাগে।

মাহুত মাথার দিকে বসে। আজকের জন্যে হাতির পিঠে সুন্দর হাওদা।

এত বড় শান্ত জন্তুটা একটা করে পা ফেলে—আর পিঠের ওপরের তপতী, রবি ঝাঁকুনিতে খুব কাছাকাছি চলে আসে—আবার সরে যায়।

নির্জন চিড়িয়াখানায় এমন রাজকীয় সম্বর্ধনা যে তাদের নিজেদের পরিচয়ে নয়—স্রেফ একটা ভুল বোঝাবুঝির দরুন—তাতে দু'জনেরই মজা লাগছিল—আবার বিশ্রীও লাগছিল। যদি ধরা পড়ে। কি কেলেঙ্কারি! তখন দিলীপ-বৈজয়ন্তীর সামনে মাথা নিচু করে চলে যেতে হবে।

মাহুত হিন্দীতে একটা ঘরের বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিল। কোন্‌টায় সাপ। কোন্‌টায় জলহস্তী। সবই ওদের চেনা। রবি হুঁ, হাঁ দিয়ে যাচ্ছিল।

একটা ঝাঁকুনিতে তপতীর কাঁধের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। মুখটা সরিয়ে নিতে নিতে রবি বলল, তোমার শাড়িতে বোটকা গন্ধ কিসের?

তপতী আস্তে আস্তে বলল, ভাতেব মাড়ের। ইস্ত্রি করে নিলাম বেরোবাব সময়।

উঃ! তপতী। তোমায় এত ভালো লাগে এজন্যে।

এতে ভালো লাগার কি আছে?

তুমি এত সোজা। এত ভালো। এত সুন্দর। নিজের হাল ফেরাবার কোনো চেষ্টা নেই। ঠিক গাছপালার মতো।

মাহুত খিদিরপুরের গেটের দিককার কাছাকাছি উট-পাখির আস্তানা দেখাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে রবি দেখলো—গেটটা খোলা। সঙ্গে সঙ্গে মাহুতকে বলে হাতি থামালো। দিলীপকুমারের দলটা তখন অন্তত দু' ফার্লং এগিয়ে গিয়েছে।

হাতি থেকে নামা কি অত সহজ। ওঠার সময় টুল দিয়েছিল। তপতী প্রায় গড়িয়ে নামলো। রবি মাহুতকে একটা দু'টাকার নোট দিয়ে এগিয়ে যেতে বলল। হামলোক পায়দল যায়েগা—

সত্তর আশি বছরের হাতিটাকে নিয়ে বিভ্রান্ত মুখে মাহুত এগিয়ে গেল। রবি আর দেরি করে! খোলা গেট দিয়ে তপতীকে নিয়ে একদম ট্রাম লাইনে।

চল না। কোথাও যাই তপতী।

যাওয়ার দশা তো দেখলে! কলকাতায় আমাদের কোনো জায়গা নেই। মনে মনে তপতী তখন অনেকগুলো জিনিস একসঙ্গে ভাবছিল। পাসপোর্ট, হেলথ্ সার্টিফিকেট—শীতের দেশের জন্যে ফ্লানেলের শায়া তিনটে। জুতো দু'জোড়া। আরও কত কি। ভাবতে ভাবতে মনে হল —বড় স্বার্থপর হয়ে উঠেছে সে। রবি তাকে শুধু দেখবার জন্যেই এতটা করে। আর সে কিনা নিজের বিদেশপাড়ি নিয়ে ভেবে যায়। সেখানকার রাস্তাঘাট কী রকম। খাওয়াদাওয়া। এলিভেটর।

চলো। কোথাও বসে কিছু খাই রবি।

আমার আজকাল কিছুই খেতে ভালো লাগে না।

ভালো করে ঘুমোও না বোধহয়। শোবার আগে টেন পারসেন্ট ডাইলিউশনের ব্রোমাইড্ মিকশ্চার খেলে পারো। আমি তো পরীক্ষার আগে খেতাম।

আমি শুয়ে বিশ্রাম পাই না তপতী। হেঁটে আমার ক্ষয় হয় না। আজকাল দিনরাতের ডিফারেন্স বুঝি না।

জানি। এজন্যে দায়ী আমি।

১০

কাগজে খবরটা বেরোতেই অফিসের ডেভলেপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্লিপিং চলে এলো রবি গুহর টেবিলে। লাঞ্চের আগে আর দেখা হলো না। খেতে বসে পারচেজের দত্ত বলল, আপনাকে তো বাঁকাদহ যেতে হচ্ছে।

সেটা কোন্ জায়গায়?

বাঁকুড়া-মেদিনীপুর বর্ডারে। আমাদের অফিস তো ডিপ টিউবওয়েলের পাইপ লাইন সাপ্লাই করেছে। আমি গেছি কয়েকবার।

ও বাঁকাদ। বাঁকাদহ বললে গুলিয়ে যায় আমার। তা তুমি তো ওখানে

যাবেই দত্ত। ভক্ত গ্রাম। তোমাদের গুরুদেবের আখড়া আছে।
আখড়া বলবেন না। বলুন আশ্রম। মানুষগুলো ভালো। এবার ওঁর পূতাস্থি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাঁকাদহে।
বাঁকাদ বল।
পুরো নাম বাঁকাদহ। উৎসব হচ্ছে। অফিস থেকে তো আপনি যাচ্ছেন শুনলাম। সিনিয়র লোক বলেই আপনাকে পাঠানো হচ্ছে শুনছি। ওখানে চাষীদের ভেতর আমাদের বড় আশ্রমের একজন কর্মী অনেকদিন ধরে কাজ করছেন। জাগরণের কাজে সময় লাগে—
রবি মনে মনে নিজেকে বলল, এই সব ধর্মঘেঁষা লোক খুব ভালো বাংলা ইউজ করে। মুখে বলল, তা ভাই আমায় যেতে হচ্ছে কেন?
আপনি যাবেন না তো কে যাবে? ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ওখানকার চাষীদের বলবেন। ওরা আপনার কথা শুনবে। পূতাস্থি সমারোহ উৎসবে বিরাট মেলা বসবে। গুরুদেবের জীবনী আলোচনা হবে। কলকাতা থেকে পাঠচক্রের অনেক লোকজনও যাবেন। ধ্যানের ব্যবস্থা হয়েছে—
ধানক্ষেতে ধ্যান!
গুরুদেব বলেছেন—যে কাজ করে সে-ই পণ্ডিত। ঘাম দিয়ে যে চিন্তা আর হয় না—তার কোনো দাম নেই।
অ। বলেই রবি লক্ষ্য করল—তার বিয়ারের জাগে খানিকটা পড়ে আছে। ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিয়ে বেরিয়ে এলো।
তখনো দত্ত তার টেবিলের আরেকজন সাত্ত্বিক মার্কা লোককে সম্ভবত বাঁকাদর কথাই বলছিল। বিল মিটিয়ে বেরোবার সময় রবি শুনতে পেল, দত্ত বলছে—ওখানে চাপা নামে একটা খাল আছে। শুশুনিয়া থেকে নেমে আসা ঝর্নার জলধারায় তৈরি খাল। সে জল ওরা খায়। চাষেও লাগায়। তবে সবসময় তো জল থাকে না। তাই ডিপ টিউবওয়েল।

রবির একদম গা জ্বলে গেল। কিছুটা সাত্ত্বিক কিছুটা ধার্মিক আর টাকায় তিরিশ পয়সার মতো কিছুটা সমাজকর্মী এইসব লোককে দেখলে পর হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। পৃথিবীটা জুড়ে কতরকমের অন্যায় গোলমাল হাওয়া বাতাসের মতোই এতকাল পৃথিবীর সঙ্গে রয়েছে। এখানে বসবাসের জন্যে নিয়মকানুনের নাম—সভ্যতা। যুগে যুগে এই বসতির ভেতর থেকেই একজন দু'জন লোক বেরিয়ে এসে এই নিয়ম-কানুনের ভাষ্যকার হন। বাইরে থেকে ভগবান বলে একজনকে আমদানী করা হয়। তাঁর ডিউটি লোক তরানো। তাঁকে ঘিরে রহস্য। তাঁকে ঘিরে ব্যাখ্যা। ধ্যান। প্রার্থন । এই কাণ্ডটা অনেক লোকজন নিয়ে যিনি ঘটান—তিনি কখনো গুরু, কখনো মহারাজ, কখনো অবতাব। আসলে তিনিও যে একজন মানুষ—এই কথাটা আমরা ভুলে যাই। তাঁরও হৃদযন্ত্র একদিন বিকল হয়।

অফিসপাড়ার ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রবির মনে পড়ল, তাদের ছোটবেলায়—যুদ্ধের শেষ দিকটায়, একবার পঞ্জিকায় ভবিষ্যদ্বাণী হল—চেতাবনী আসন্ন। অমুক তারিখে পৃথিবী রসাতলে যাবে। যারা ঢেঁকিতে চিড়ে কুটতো—তারা পর্যন্ত রবির মাকে এসে বলে গেল—আর তো এগারো দিন! তারপরেই তো পৃথিবী রসাতলে। তুমি বৌদিদি ছাদে ধান শুকোতে দিয়ে শুধু শুধুই পরিশ্রম করে মরছ!

রবির মা ভানকি মেয়েদের বলেছিল, তা কি করব বল? রসাতলে গেলেও তো খিদে পাবে। তখন ভাতের চাল কে দেবে? তাই সেদ্ধ শুকনো করে রাখছি।

রসাতলের পর বাঁচলে তো তবে খিদে! আমরা আমাদের রানীর টাকা-গুলো স্যাকরার দোকানে এক সিকি বেশীতে বেচে দিচ্ছি।

রানীর টাকা মানে আগেকার মহারানী ভিক্টোরিয়ার রুপোর টাকা। মা বলেছিল, একটা করে সিকি বেশী পেয়ে বুঝি রসাতলে খেয়াভাড়া দিবি! বোকা পেয়ে তাদের রুপোর টাকাগুলো স্যাকরা হাতিয়ে নিচ্ছে।

সেদিন কিন্তু ভানকি মেয়েরা বিশ্বাস করে নি। বরং তার মায়ের জন্মে করুণা করে তারা হেসেছিল। চেতাবনীর দিন সন্ধ্যে পর্যন্ত কিছুই ঘটলো না। দিব্যি সূর্য উঠলো। ডুবলো। সন্ধ্যার চাঁদ হাজির। পরের দিন সকালে এসে গেল সকালে। ভানকি মেয়েরা আবার ঢেঁকিতে পাড় দিতে বেরুলো।

সুজাতা আটা মাখছিল। আলু পটলের ডালনা চড়াবে। জামাকাপড় ছেড়ে পাখার নিচে বসেও দেখলো সুজাতা কোনো কথা বলছে না। এটা অবশ্য নতুন নয়। ও কোনোদিনই বেশী কথা বলে না। দু'এক পদের তরকারি রাঁধে। বিকেলে চুল বেঁধে সিঁদুর দেয় কপালে। হাতে কাজ না থাকলে পারলে একখানা বই নিয়ে বসে বিছানায়। নিষ্পলকে পড়ে যায় পাতার পর পাতা। ভালোমন্দ কোনো উচ্ছ্বাস নেই। তখন বিশেষ করে মনে হয়—সুজাতা একজন সুন্দরী রমণী।

বুবু কোথায়?

বায়না ধরেছে—তোমার সঙ্গে কাল বাঁকাদ যাবে। বাই রোডে যাচ্ছো তো।

হুঁ। কিন্তু আমার তো অনেক কাজ থাকবে। ও সেখানে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠবে।

বিকেলে টিউটোরিয়াল থেকে ফিরতেই ওকে দোতলায় বাড়িওয়ালার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন টি. ভি. দেখছে! ও কিন্তু যেতে চাইবে বলে দিলাম।

অন্য একটা কথা বলি সুজাতা।

সুজাতা পুরো মুখ তুলে তাকালো। এখন ওর মুখে সব জায়গায় আলো পড়েছে। আগে চোখে সুরমা দিত। বাপের বাড়ির অভ্যেস।

আমার বন্ধুদের বউদের দেখেছি—স্বামী বাইরে থেকে এসে গা খুলে বসলে তারা পিঠে হাত রেখে 'হ্যাঁগো', 'ওগো' বলে।

তাতে কি হয়? শুনতে কি খুব ভালো লাগে!

সুজাতার কথার ধারায় রবি কুঁকড়ে গেল। কম কথা বলে, তার চেয়েও কম তাকায়—রান্না আর কিছু কাচাকাচি ছাড়া আর কোনো মহৎ কাজে এই মহিলাকে কোনোদিন বিশেষ দেখা যায় নি। তবু সাহস সঞ্চয় করতে লাগল রবি।

খারাপ তো লাগার কথা নয়। আমি ওগো বললে তোমার ভালো লাগে না?

লাগে। কিন্তু কোনো কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

পাখাটা চালিয়ে দিয়ে রবি টানটান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। চল ক্লাবে যাই। তোমাকে দেখে সবার জ্বলুনি হবে তাই দেখবো। আমার এত সুন্দরী বউ—বলতে বলতে রবি বিছানা ছেড়ে উঠে প্রায় দশবারো বছর পরে সুজাতাকে চুমু খেতে এগোলো।

হয়েছে। এখন শুয়ে থাকো তো। আজ এত উচ্ছ্বাস কিসের! তপতীর সঙ্গে দেখা হল বুঝি!

না তো। সময় পেলাম কোথায়।

অ। তারপর একটু থেমে বলল, স্ত্রীকে সত্যিকথা বলাই ভদ্রলোকের কাজ। তাই না!

একথা বলছো কেন? আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না!

বুবু আজ স্কুলে বেরোবার সময় একটা ফোন ধরেছিল।

কার?

তোমার। তপতী ফোন করেছিলেন। ক'দিন কলকাতায় থাকছেন না—সেকথা তোমায় জানাতে বললেন। ফোন করতেও বারণ করেছেন এ ক'দিন।

আমি তো বিশেষ ফোন করি নি। শুধু একবার—

গিয়েছো ক'বার?

তাও একবার সুজাতা। তোমায় আজ বলব ভেবেছিলাম।

না। থাক। আমার শোনার কোনো ইচ্ছে নেই।

না শুনলে তুমি নানারকম ভাবতে পারো। তপতী একদম বদলে গেছে। ধ্যান করে।

কিসের ধ্যান! হাসি চাপতে পারছিল না সুজাতা। এখন তো সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেছে। আর ধ্যান কি জন্যে?

ওর ধ্যান গুরুদেবকে নিয়ে। বুঝতে পারছি না—ধ্যান, জপ, তপে এতটা মজলো কেন?

সে খাতায় তোমার নাম লেখাতে বলে নি?

বলেছে।

জানতাম।

বড় নরম মেয়ে। সরল মেয়ে তপতী। ওকে ওভাবে বোলো না।

কেন বলব না। তুমি তখন ভালো কাজ কর না বলে—সবকিছু মুছে দিয়ে অন্য জায়গায় বিয়ে বসে—তোমায় রাতারাতি বন্ধু হতে বলে—সে কোন্ সুবাদে ধ্যান করে? কিসের ধ্যান করে আমায় বলতে পারো?

ওভাবে দেখো না সুজাতা। আমাকে তেমন না লাগার কারণও তো সেদিন তপতীর থাকতে পারে। রুচির ওপর কোনো কথা হয় না।

রুচি তোমার আকাশ নয়। শরতের মেঘে এসে ঘন ঘন বদলে দেবে—

তুমি তো বেশ কথা বল সুজাতা। ভালো কথা। হয়েছে?

সুজাতা ধমক দিয়ে রান্নাঘরে গেল। যাবার সময় বলল, বিশ্রাম নিচ্ছ—বিশ্রাম নাও।

না। না। শোন। ঠিকমতো না হলে তোমার শরীর ভীষণ খারাপ হয়ে যাবে।

গত মাস থেকেই পিল বন্ধ করে দিয়েছি। ভালো মতো হচ্ছে না। দু'দিন হয়েই থেমে যায়।

তুমি ডাক্তার দেখাও। আজই যাও।

এখন তো আর ডাক্তারবাবুকে পাওয়া যাবে না। কাল দেখাবো। আমার

চেহারা তো একদিন খারাপ হবেই—
যেদিন হবে সেদিন। এখন নয়। এখন তোমার মাথায় একটা পাকা চুল দেখলে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কোনো কাজ করতে পারবো না। ইচ্ছে চলে যাবে।
মত আদিখ্যেতা। কাল ভোরে যদি বেরোও তবে সুটকেশ সাজিয়ে দেব কখন? ডালনাটা চাপিয়ে আসি—তারপর তোমার কথা শুনবো।

খড়্গপুরের বাইরে গ্যাশনাল হাইওয়ের ওপর গোল চক্করটা ডাইনে ফেলে অফিসের গাড়িটা মেদিনীপুরের দিকে বাঁক নিল। মেদিনীপুর শহরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জেলা বর্ডার ক্রস করলেই বাঁকুড়ার একদম শুরুতেই বাঁকাদ। ড্রাইভার তাই বলছিল রবিকে।
রবি সকাল থেকেই ঘুমোচ্ছিল। মেদিনীপুর পেরোতেই চাঙ্গা হয়ে উঠলো। দু'ধারে শাল জঙ্গল। প্লেন পিচরাস্তা। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ধাঁচে লালমাটি খাড়াই আকাশে উঠে গেছে। সবুজ ঘাস না পেয়ে আশাহত গরু তার এখানে সেখানে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে।
গাড়ি থামাতে বলতেই ড্রাইভার বুঝলো। পায়ের কাছে ছোট আইস-বক্সের ডালা খুলে গুহ সাহেবের আদরের জিনিস বের করে দিল। রবি পাঁচ ছ' ঢোকে নীট খানিকটা শরীরে পাঠিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল। অফিস সিনিয়র লোক হিসেবে তাকেই পাঠিয়েছে—তার কারণ, গুরু-ভক্ত এই বাঁকাদ গাঁয়ে পূতাস্থি সমারোহ উৎসবে—এমন অনেকেই আস-বেন—যাঁরা ওঁর ভক্ত—আবার সরকারী বেসরকারী নানা জায়গায় তাঁরাই কর্তাব্যক্তি। রবিদের কোম্পানি ডিপ টিউবয়েলের পাইপলাইন বসিয়েছে। জলের প্রেসার অনুযায়ী এক একটা চাকা ঘোরালেই দূরের দূরের মাঠে দিব্যি জল পৌঁছে যাবে।
বেলা এগারোটা নাগাদ পৌঁছে বাঁকাদ প্রাইমারি স্কুলের একটা বড় ঘরে থাকবার খাবার জায়গা পেয়ে গেল রবি। বিকেল চারটেয় উৎসব

শুরু। স্নান করবো কোথায় ভাই ?

একজন ভলান্টিয়ার আঙুল দিয়ে পিচ রাস্তার খানিক ওপারে একটা জল-ধারা দেখিয়ে দিল। কেন ? চাপা খালে চলে যান।

এতটা পথ। খোলা গায়ে চান করব কি করে ?

সবাই যাচ্ছেন। বেরিয়ে দেখুন না একবার। চাপা খালের জল এক-দম টলটলে।

সত্যি তাই। জলে নেমেই রবির সারা গা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সারা শরীরে রামের ঝাঁঝ। তার ওপর ঠাণ্ডা জল লেগে চাপা খালের ভেতরেই রবির সারা শরীরে এক রকমের আরামের আগুন ধরে গেল। সবই খুব সহজ হয়ে গেল।

পিচরাস্তা পেরিয়ে অনেকটা নাবি জমি। দু'একখানা মাটির ঘর। তার দেওয়ালের গড়বেতা রূপছায়া ময়দানের যাত্রাগানের পোস্টার। সিজিন টিকিট দশ টাকা। চাপা খালের গা ধরে ষোল সতেরখানা নানা রঙের গাড়ি দাঁড় করানো। কলকাতা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলীর স্বচ্ছল ভক্তদের ফ্যামিলিগুলো এখন খালের জলে। কেউ কেউ জল থেকে উঠে গাড়ির ভেতর থেকে সোপকেস নিয়ে আবার জলে নামছে। কাছেই কমিউনিটি কিচেন থেকে গাঁয়ের পরিষ্কার আকাশে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছিল। উল্টোদিকে বিরাট খড়ের গাদা। চাষীদের এই এক অভ্যেস। বচ্ছরকার খড় একবারে জমিয়ে রাখিবে। তারপর সোজা উত্তরে এগিয়ে সারি সারি তাঁবু। সমারোহ বটে। একজন গুরুদেব আছেন বলে। নয়ত তিনি না থাকলে এ আয়োজন তাঁবু-ফেলা গাঁয়ের সার্কাসের সঙ্গেই শুধু মেলে।

মা ভাখো।

পাশ থেকে চেনা গলা পেয়ে ঘুরে তাকালো রবি। গলা জলে তপতী দাঁড়িয়ে। পাশে এষা।

রবি বলল, আমি জানতাম তুমি আসবে।

আমি কিন্তু জানতাম না। ফোন করেছিলাম।

জানি। কলকাতায় থাকবে না জেনে বুঝেছিলাম—গুরুদেবের এ উৎ-সবে আসছো।

তুমি এলে যে—

অফিস পাঠালো। বাঁকাদ-র চাষের জলের পাইপ লাইন আমাদের বসানো।

ওঃ। কি ভালোই যে লাগছে। সুবিনয় যদি আসতো। ওর খুব ভালো লাগতো। তবু বেশ খুশীতেই খালের জলে মুখ দিয়ে মা মেয়ে একসঙ্গে বুড়বুড়ি কাটছিল। তারপর এষার সামনেই পরিষ্কার বলল, বলেছিলাম না—আগের জন্মের যোগ আছে তোমার সঙ্গে। তোমার দুঃখের বোঝা আমাকে দিয়ে দাও।

আমার কোনো দুঃখ নেই তপতী। এতকাল পরে থাকেও না মানুষের। বলতে বলতে অবাক হয়ে দেখলো, কথাটা শুনে তপতী একটা ডুব দিল। তারপর ভেসে উঠেই বলল, তুমি আগে ওঠো।

কেন ?

তোমার সামনে আমি ভিজে কাপড়ে ওপরে উঠতে পারব না।

এখানে তো আমি ছাড়াও আরো পুরুষ মানুষ আছে।

তুমি আমার কাছে আজও আলাদা রবি। ভগবানের সঙ্গে এমনিতে তো মেলামেশা হয় না।

রবি জল থেকে তীরে উঠতে উঠতে বলল, তাই নাকি।

নিচে জলে দাঁড়ানো তপতী বলল, আমার একটা অনুরোধ রেখো। জীবিত মানুষকে নিয়ে ধ্যান কোরো না।

রবি গা মুছতে মুছতে তীরে দাঁড়িয়ে ভাবলো, তুমি আর আমার ধ্যানে আছো! যেমন গরম পড়ছে—সন্ধ্যের দিকে আইসবক্স থেকে বিয়ার ঢেলে খেতে ভালোই লাগবে। চাই শুধু একটা নির্জন গাছতলা।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর এষা এসে রবিকে ওদের তাঁবুতে ডেকে নিয়ে

গেল। নিচে ঘাস। তার ওপর ক্যাম্বিশের চৌকি। বেতের চেয়ার। টেবিল। ফুলদানীতে চাপা খালের ধারের বুনোফুল বসানো। মেঘলা আকাশ থেকে ঠাণ্ডা বাতাস নেমে এসে মাঠের কচিকাঁচা শালগাছগুলোকে দোলাচ্ছিল। মেদিনীপুর থেকে বাস এসে লোক নামিয়ে দিয়েই বাঁকুড়া ছুটছে।

তাঁবুতে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল রবি। তপতী পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে রবি দাঁড়াল।

এষা ছুটে এলো। বাইরে কেন? ডেকে নিয়ে এলাম—ভেতরে এসে বসুন। মা এখুনি উঠে যাবে?

তোমার মা ডাকে নি আমায়?

না তো। আমি ডেকেছি। কেন? আমি কি ডাকতে পারি না?

নিশ্চয়ই পারো। ঢোঁক গিলে নিয়ে রবি বলল, তাঁবুর ভেতরে না বসে আমরা বরং তাঁবুর ছায়ায় এখানটায় বসি। ঠাণ্ডা আছে। ঘাস আছে।

বেশ তো। বলে এষা তার পাশে বসে পড়ল।

রবি অবাক হচ্ছিল। মোটে এগারো বারো বছরের মেয়ে। অথচ কত পরিণত। মুখখানা স্নিগ্ধ, সরল, কিন্তু দৃঢ়। এর ভেতরেও একটা পবিত্র উন্মনা ভাব।

আপনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন?

কি জবাব দেবে রবি। তা এক রকমের পেয়েছিলাম। তুমি জানলে কি করে?

জানি। মা বলেছে।

এষার দৃষ্টি সামনের চাপা খালের ওপারের মাঠের গাছপালায়।

আপনাকে প্রার্থনার একটা গান শোনাই। আমাদের বড় আশ্রমে ঐ গানটা হয়। গুরুদেবের সমাধির সামনে বসে সবাই এ গানটা গায়। একজন ভক্ত লিখেছেন। সুর তাঁরই—

যতক্ষণ এষা গাইলো—ততক্ষণ ওর চোখেমুখে প্রণতি ফুটে থাকলো।

গানের সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা মাটির দিকে বুজে আসছিল। আবার গুরুপ্রীতিতে সেই কিশোরী দৃষ্টি আরতির প্রদীপ হয়ে উঠছিল। এইটুকু মেয়ে। ওর পক্ষে সত্যিই কি এতটা ভক্তি, এতটা সমর্পণ সম্ভব ? ভক্তি কি বালিকার ভেতরে পরিণতি আনে ? স্নিগ্ধ পরিণতি। রবি বুঝে উঠতে পারছিল না। গান থামিয়ে এষা এমন কবে হাসছিল—যার অর্থ এও হতে পারে—আহা ! মানুষটা বড় ভালো। মায়েব জন্য একদিন খুব কষ্ট পেয়েছে। আমি ওকে শাস্তি দেব। গভীর করুণায় এষাব চোখ পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। রবি বুঝলো, এমন মেয়ের মা হয়ে তপতী ভাগ্যবতী। সুবিনয়ের ভেতরে নিশ্চয় জিনিস আছে। নইলে এমন মেয়ে হয় না।

মেলায় লোক জড়ো হচ্ছিল। রবি বলল, তোমার ভিসনের কথা বলবে ?

আমি লিখে রাখি। দেখবেন।

চার নম্বর বাঁধানো একখানা এক্সারসাইজ বুক এনে দিল এষা। তাবপর বালিকাদেব যেমন হয়—আসলে এষা তো বালিকাই—একটা প্রজা-পতির পেছন ছুটতে ছুটতে চাপা খালের উঁচু পাড়ে গিয়ে হাজির হল। নীল প্রজাপতিটা একবার এখানে বসে—আরেকবার সেখানে। এষা ধরতেই পারেনা। তাঁবুর ছায়ায় বসে রবি প্রজাপতিটাকে আর দেখতে পাচ্ছিল না। এখন এষা উঁচু বাঁধের ওপর প্রায় প্রজাপতি হয়ে এখান সেখান করে উড়ে বেড়াচ্ছে। ভেতরে তপতী ঘোর ঘুমে।

কি আর করে। রবি ভিসনের খাতাখানা খুললো। তাতে মলাটের ভেতর দিকে লাল কালিতে আঁকা একটা বল কালো রেখার ঢেউয়ের ভেতর থেকে জেগে উঠছে। অর্থাৎ সূর্য। ডান হাতে এষার নাম লেখা। তার পর বড় বড় অক্ষরে লেখা—

ধ্যানের অভিজ্ঞতা

॥ ১৫ই নভেম্বর ১৯৭৩॥

প্রথমে দেখলাম যে, আমি গুরুদেবের শোবার ঘরে গেছি। তারপর আমি বাগানে গেলাম। নানা রংঙের গোলাপ দেখলাম। সোনার

গোলাপও দেখলাম। তার পাতাগুলো ছিল রুপোর। সেখানে চিরঞ্জীব বটগাছের প্রতি পাতায় দেখলাম চোখ আছে। ধ্যানে বসলাম। সেখানে সূর্যের আলো পড়ে আমার শরীর ঝলসে দিচ্ছিল।

বেশ তরতর করে পড়তে লাগল রবি।

পথে অনেক বন্যজন্তু দেখলাম। সে পথ পেরিয়ে একটা মন্দিরে পৌঁছলাম। মন্দিরে ময়ূরের চোখ দুটো পাথরের। একটা পাথর তুলতেই একটা মণি পেলাম। মণিটা নিয়ে ব্রহ্মার কাছে গেছি। ব্রহ্মা মণিটিকে আকর্ষণ করলেন। হঠাৎ কোত্থেকে আমার হাতে একটা চক্র এসে গেল। সেই চক্র দিয়ে আমি কতগুলো গাছ কেটে ফেললাম। যে জায়গায় গাছগুলো কাটলাম—সেখানেই শিবমন্দির উঠেছিল।

এই অব্দি পড়ে রবি খাতা বন্ধ করলো। এষা তখনো প্রজাপতিটাকে ধরতে পারে নি। উঁচু খালপাড়ে মিশমিশে কালো পাতার ছায়া ধরে দুটো গাছ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তাদের নিচে একজন উৎফুল্ল আশ্রম বালিকা হয়ে এষা তখনো প্রজাপতির পেছনে ছুটোছুটি করছিল। তার পেছনের চাপা খালের জলে নরম রোদ।

এসব তপতীর কাণ্ড নয়তো। ছোটবেলা থেকেই এষার মনে এমনভাবে পাখিপড়ার মতো সব ঢুকিয়ে দিয়েছে—হয়তো তারই ফলে বয়সের পক্ষে একদম বেমানান এই স্বপ্নগুলো এষা দেখে যাবে। কিংবা বানিয়ে বানিয়ে ভেবে নিয়ে লিখে রাখে। রবির এ কথাও মনে হল—আমি তো ধর্মের কিছু জানি না। গুরুদেবের কিছুই জানি না। যারা মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে—তাদের হয়ত এরকম হয়। আমাদের মতো সাধারণ লোকের এ কথা জানার কথা নয়। না বুঝে অবিশ্বাস করারই কথা।

উঁকি দিয়ে দেখলো, তপতী তখনো পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। একদম অসাড়ে। এত গুরুদেব, এত ধর্ম ওর শরীরে এলো কি করে?

আবার 'ধ্যানের অভিজ্ঞতায়' চোখ নামালো রবি।

শিবমন্দিরে গেলাম। সেখানে হঠাৎ একটি লোক এলো। লোকটি বিরাট

দেখতে। মন্দিরটি কাঁপতে লাগলো।

মাথা তুলে রবি জোরে ডাকলো, এষা। আর যেও না। চলে এসো। ওদিকটায় যেয়ো না।

এষা ততক্ষণে খালপাড়ের নাবিতে নেমে গেছে। সে কোনো সাড়াই দিল না। প্রায় বিকেলে বাঁকুড়ার গ্রাম। তার ভেতরে অবিশ্বাস্য চেহারার গুটি কয় তাঁবু। নানা রঙের কয়েকটি গাড়ি। মেলামণ্ডপ। চাপা খাল। আকাশে মেঘ মাখানো রোদ্দুর।

তাঁবুর পর্দা সরিয়ে তপতী বাইরে বেরিয়ে এলো। ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে তো।

বুঝতে পারি নি। তোমায় দেখাচ্ছে কিন্তু সুন্দর।

এই দেখাদেখিটা তোমরা ভুলতে পারো না রবি? বলতে বলতে মোড়া এনে বসলো তপতী। শরীর বাদ দিয়ে কিছু ভাবতে পারো না। দেখি তোমার হাতখানা। বলেই নিজের হাতে রবির ডান হাতখানা নিল তপতী। বেশ পরিষ্কার দীর্ঘরেখা। হাত ছেড়ে দিয়ে তপতী বলল, এই তো তোমার হাত ধরে দেখলাম। কতকাল পরে। কিছুই তো হল না।

এষা তো এখনো ফিরলো না। খুঁজে নিয়ে আসি।

গুরুদেব আকাশ থেকে ওকে সবসময়ে দেখেন। ওর জন্যে চিন্তা নেই। তুমি বোস রবি।

রবি বসেই ছিল। ঘাসের ওপর। তাঁবুর খুঁটিতে হেলান দিয়ে। তাঁবুর আড়ালে এদিকটায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রবি আচমকাই উঠে দাঁড়াল। তারপর নিজের দু'হাতের অঞ্জলিতে তপতীর মুখখানা তুলে ধরে তাকালো। তপতীও পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। রবি মুখ নামিয়ে এনে খুব ঘন করে চুমু খেল।

রবি মুখ সরিয়ে নিতে তপতী বলল, তুমি ইনকরিজেবল্! এখনো আমায় ভুলতে পারো নি? বিয়ের এতদিন পরেও! আমায় কিন্তু এ চুমু স্পর্শ করতে পারে নি। আমি ভগবানের—

বলতে বলতে তপতী তাঁবুর ভেতরে যাচ্ছিল। রবি মনে মনে বলল, তুমি যদি ভগবানের হও তবে কেন এখন তাঁবুতে ঢুকে মাথার চুল, মুখের পাউডারের প্রলেপ ঠিক করতে যাচ্ছ? দেখাচ্ছি দাঁড়াও। কে ভগবানের এবার তা তুমি জানাবে।

পেছন থেকে রবি জড়িয়ে ধরতে তপতী আস্তে বলল, ছাড়ো বলছি।

সেই কথা-বলা মুখের ওপরেই রবি দু' দু'বার জোরে চুমু খেল। মরশুমের প্রথম রসালো ফলে মানুষ এভাবেই মুখ দেয়।

ছাড়ো। আমার কোনো ইচ্ছে নেই।

রবি এক একটা কথায় ধাক্কা খাচ্ছিল। অপমানে মরে যাচ্ছিল। আবার ফিরেও আসছিল নিজের আবেগে। আর তখনই তপতীর ঘাড়ে গলায় চুমু দিতে দিতে বুকে নেমে আসছিল রবি।

রবি জানতো। মানুষের যা হয় আর কি। তপতী অবশ হয়েই আসছিল। আর তখনই রবি আরও জোরে জড়িয়ে ধরল। এখন এষা বাইরে চাপা খালের তীরে প্রজাপতি ধরছে।

একদম শেষের দিকে তপতী মোটে একবার বলতে পারল, না রবি। না। বলেও বুঝতে পারল—রবি নয়, সে নিজেকেই আর আটকাতে পারবে না। অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন।

রবি বাইরে এসে তপতীর মোড়ায় বসল। মেলায় তখন মাইক টেস্ট হচ্ছে। প্রজাপতিটাকে জ্যান্ত অবস্থায় আলতো করে ধরে এনে এষা ফিরে এলো। সারা মুখে ঘাম। প্রজাপতিটাকে সে ধরতে চেয়েছে। মারতে চায় নি। আলগোছে রবির হাতে তুলে দিল। সাবধানে ধরে রেখো। মাকে ডেকে আনছি—

এষা এই প্রথম তাকে তুমি বলে ডাকলো। প্রজাপতিটা রবির হাতখানাকে গোলাপডাল ভেবে স্বাধীনভাবেই বসে থাকলো।

এষা কিন্তু অনেক ডাকাডাকি করেও তপতীকে তাঁবুর বাইরে আনতে পারল না।

ছায়া পড়ে আসতে সামিয়ানার নিচে গুরুভক্ত চাষীদের জমায়েতে রবি পাতালের জল, ডিপ টিউবওয়েল এসব নিয়ে লেকচার দিতে দিতে এক-বারের জন্যে ভিড়ের ভেতরে তপতীর মুখ যেন দেখতে পেল।

রাত আটটার ভেতর সভা ভঙ্গ।

সবাই চালাও বসে খাবার সারিতে খেতে শুরু করার আগে একজন মন্ত্র গান করে গাইলো। তারপর—ডাল, ভাত তরকারি। শেষপাতে খানিকটা সুজির পায়েস। যে যার এঁটো নিয়ে উঠতে হল।

রাত ন'টা না বাজতেই বাঁকাদ'র সব শব্দ জুড়িয়ে এলো।

স্কুলঘরের বড় ঘরে শুয়ে ঘুম আসছিল না রবির। ড্রাইভার শুয়েছে বারান্দায়। বাড়িটার জানলার পেছনেই গুচ্ছের ঝিঁঝি। সম্ভবত তাদের নিয়েই বাঁকাদ অর্কেস্ট্রা পার্টি গঠিত। অন্ধকার জানলার পেছন থেকেই এই বৃন্দবাদন তার চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছিল। মুখের ভেতরটা সিগারেটের তামাকে তেতো হয়ে আছে। স্কুলের মাস্টারমশায় খাওয়া-দাওয়ার পর একটা হেরিকেন দিয়ে গিয়েছিলেন। সেটা উসকে দিয়ে রবি এষার খাতাখানা খুলে বসলো। ধ্যানের অভিজ্ঞতা। কোনো এক-জায়গায় রবির চোখ আটকে থাকছিল না। সে ভেবেই পাচ্ছিল না —আজ তপতীকে সে জয় করেছে? কিংবা লুট? অপমান? অথবা জাগ্রত করেছে? শরীরের ধর্মে তপতীকে কি সে জাগিয়ে তোলে নি? খানিকক্ষণের জন্যে? কেননা, তপতীও তো শেষদিকে পুরোদস্তুর যোগ দিয়েছিল। তবে?

এষার ধ্যানের অভিজ্ঞতার এক জায়গায় তার চোখ আটকে গেল।

॥ ১২ই অক্টোবর। ১৯৭৩॥

প্রথমে আমি দেখলাম যে গুরুদেব যেন একটা সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছেন। সমুদ্রের ওপারে যেন সূর্য দেখা যাচ্ছে। সেই সূর্যটা যেন গুরুদেবের দেহে লাগছে। আর গুরুদেব আমার দিকে তাকিয়ে হাস-ছেন। তারপর দেখলাম হিমালয় পর্বত। সেই পর্বতের চূড়ায় একটি

শিবলিঙ্গ দেখলাম। কিছুক্ষণ পরে যেন ম্যাজিকের মতো শিবও এসে লিঙ্গের পাশে বসলেন। তারপর আমি কয়েকটি সুন্দর সুন্দর পাখি দেখলাম। সেই পাখিগুলো যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। তারপর দেখলাম —সব পাখিগুলো যেন একসঙ্গে মিশে গেল। একসঙ্গে মিশে একটি বিরাট পাখি তৈরি হল। সেই পাখিটি যেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার মধ্যে আমি যেন বিশ্বরূপ দেখলাম। মুখ তুলে অন্ধকার জানলায় তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না রবি। মাত্র এগারো বারো বছরের মেয়ে এষা। অথচ কত পরিণত। সত্যি কি ও এসব বোঝে ? কিংবা বিশ্বাস করে ? এমনভাবে আজ দুপুরে প্রার্থনার গানখানি গাইলো—চোখের ভঙ্গী, ভ্রূর টান—সবকিছু সমর্পণের—গুরুদেবে সমর্পণ—একেবারে যেন সমর্থা তরুণী। তরুণীই বা কেন! যেন যুবতী। ঈশ্বরভক্তি মানুষকে কি বয়সের আগে পরিণতি এনে দেয় ? সমর্পণ পূর্ণাঙ্গ করে তোলে ?

ড্রাইভারকে ডাকলো রবি। গাড়ি বের কর। ঘরে গরম লাগছে।

ট্রাউজারের ওপর হাতকাটা গেঞ্জিটা পরে নিল। বারান্দায় বেরিয়ে এসে ফিকে অন্ধকারে চাপাখালের গায়ে সারি সারি সাদা রঙের তাঁবুগুলো দেখতে পেল। কোনো কোনোটায় হেরিকেন জ্বলছে। ব্যাটারির মাইকসেট ডেকরেটর গুটিয়ে নিয়ে চলে গেছে। এখানে শুধু ডিপ টিউবওয়েলের জন্যে হাই-টেনশন লাইন থেকে ইলেকট্রিক এসেছে। গুরুদেবের নামে কত তাঁবু। কত গাড়ি। স্বচ্ছল পরিবারগুলির ধর্মসাধনা। এলাহী কাণ্ড। রবির ভেতরে ভেতরে সারা জিনিসটার জন্যে যা একটু একটু উসকে উঠছিল—তা আসলে বিদ্বেষ। আর সেটা বুঝতে পারলো খানিক পরে।

ফাঁকা স্টেট হাইওয়ে। পেটে ডিপ্লোম্যাট। মাঝে মাঝে বাঁকুড়া কিংবা মেদিনীপুরের লম্বা পাড়ির বাসকে জায়গা করে দিতে হচ্ছিল ঘাসে নেমে গিয়ে। জয়পুরের জঙ্গলের কাছাকাছি গিয়ে ফিরে এসেছিল রবি। ড্রাই-

ভার বলল, এবার স্টিয়ারিং আমায় দিন।

রবি পেছনে এসে বসল। জানলার বাইরে দু'ধারের অন্ধকার পিছলে যাচ্ছিল। আমি রবিরঞ্জন গুহ। বুবু, টুনির বাবা সুজাতার স্বামী। একদা সেই কোন্ যুগে তপতী আমায় ভুলিয়েছিল। তপতী শেষ অব্দি বিষাদ দিয়েছিল। আজ আমি জিতে যাই নি। হেরে যাই নি। তবে কী ঘটলো। মুখের ভেতরটা হুইস্কি খেয়েও তো তেতো হয়েই আছে। তবে কি আমার ভেতর বাগ আছে। সে বাগটা কিসের? মাত্র এক-খানা চিঠিতে তপতী সব চুকিয়ে বুকিয়ে দিয়েছিল বলে? সেদিন আমি সামনাসামনি পাই নি বলে কিছু বলতে পাবিনি। লণ্ডন টিউবে অ্যাকসিডেণ্ট হল। মারা গেল নব্বইজন। সি টি ও থেকে টেলিগ্রাম করলাম। জবাব এসে গেল—চিন্তার কোনো কারণ নেই। ভালো আছি। তখন যে আমি কী খারাপ ছিলাম।

কাঠের পুল পেরোতেই রবি বুঝলো, বাঁকাদ এসে গেছে। গাড়ি আস্তেই চলছিল। তখনো রাস্তায় মেলা ফেরত মানুষ দু'একজন। পিচরাস্তার পাশেই খালের ওপর হেডলাইটের আলো পড়তে রবি বুঝলো—কল-কাতার কিংবা কাছাকাছি মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার কোনো সচ্ছল ভক্ত পরিবারের মহিলারা সপরিবাবে রাতের বাতাসে ঠাণ্ডা খেতে বেরি-য়েছে। তাদের পেরিয়ে যেতে যেতে একজায়গায় রবি ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলল। গাড়ি নিয়ে তুমি স্কুলে যাও। আমি হেঁটে যাচ্ছি।

গাড়ি বেরিয়ে যেতে রবি ঘাসের ওপর হাঁটতে লাগল। সে ঠিক দেখেছে। তপতী পিচরাস্তার দিকে পেছন ফিরে ঘাসে ঢাকা মাটির ঢালুতে বসে আছে। মুখখানা অন্ধকারের দিকে ফেরানো। পা মুড়ে শাড়ির জরি পাড় ঘাসে লুটোচ্ছে। রবি মনে মনে বলল, গুরুদেবের পূতাস্থির পবিত্র প্রতিষ্ঠা সমারোহ আসলে কিছু স্বচ্ছল পরিবারের ভক্তির নামে ঢালাও আউটিং। খালের জলে স্নান। তাঁবুতে থাকা। গ্র্যাণ্ড পিকনিক। তার সঙ্গে ফাউ কিছু চাষীবাসী ভক্ত পরিবার। খাটুনিটা

তাদের ওপর দিয়েই যাচ্ছে।

বাঁকুড়া থেকে মেদিনীপুর যাওয়ার বাস এসে থামলো। চলে যেতে রবি একদম তপতীর পেছনে এসে দাঁড়ালো। এষা আসে নি ?

তাঁবুতে ঘুমোচ্ছে।

একা একা।

সারা দুপুর একটুও তো শোয় নি। তুমি কোথায় গিয়েছিলে। ঘরে দেখলাম না।

ঘর অব্দি গিয়েছিলে ? আমার কি ভাগ্য ! এ-পর্যন্ত বলে রবির একটা ছবি মনে এসে গেল। আজই বিকেলের। মনে পড়তেই সে ধপ করে তপতীর পাশে বসে পড়ল। দুপুরে রবির যা হয় নি—এখন তাই হচ্ছিল তার। অন্ধকারে তাকানো তপতীর মুখখানা ধ্যানী, অহংকারী হয়ে সে-অন্ধকারে ফিকে আলো হয়ে ফুটে উঠছিল। এবার তার ভয় হল। অনেক-কাল পরে আবার তপতীকে তার সুন্দর লাগতে লাগলো। যা আজ বিকেলের দিকেও লাগে নি তখন বরং একটা অসুন্দর জিনিসকে জাগিয়ে তোলার জন্য রবি নিরাসক্ত সাধু হয়ে কর্মে গা ভাসিয়েছিল। সেই ঘটনার সঙ্গে রবির ভেতরকার রবির কোনো যোগ ছিল না। তবে তাতে জেদ ছিল। রাগ ছিল। এর আগে রবি কখনো তপতীর সামনে গা এতখানি খোলে নি।

এষা ঘুমিয়ে পড়তে হাঁটতে হাঁটতে তোমার স্কুলঘরে গেলাম। তারপর খালপাড়ে। সেখানে ভালো লাগল না। তখন এই রাস্তার ধারে।

তোমাদের ড্রাইভার কোথায় ?

বাঁকুড়ায় গেছে। ওখানে বাড়ি, কালই ফিরে আসবে। তারপর আচমকাই বলল, তোমার তো পঁচিশে মে জন্মদিন।

মনে রেখেছো তপতী।

ভুলবো কেন। জন্মদিন থেকে মানুষ চাইলে সুন্দর জীবন কাটাতে পারে। জন্মদিনকে গুরুদেব বলেছেন—নিউ বার্থ। নবজন্মের আকাঙ্ক্ষা করো

কি না—সেটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

আমি একটা মানুষ! তার আবার জন্মদিন। কবেই অর্ডিনারি হয়ে গেছি তপতী।

আমি গুরুদেবের কাছে আমার ইউজুয়াল প্রার্থনা করে যাব যাতে তুমি মানুষের প্রতি বিদ্বেষ ভুলে যাও। শুধু নিষ্পাপ, সুন্দর জিনিসই নয়—পাপী, অসুন্দর, অসৎ—সবাইকেই সমানভাবে ভালোবাসতে শেখো।

নিজেকে এত ক্ষমাসুন্দর ভাবছো কেন! ধর্ম হয়তো তোমার কাছে ভাতের পাতে আমের আচার। তুমি টের পাচ্ছো না। জীবন করতে গিয়ে ভালো লাগছে—তাই গুরুদেব গুরুদেব করে যাচ্ছো।

তপতী ঠাণ্ডা গলায় অন্ধকারে তাকিয়ে বলল, আমি যাকে চাইব—তাকেই আমি পাব—এটা অহং মেশানো ভালোবাসা।

এসব তোমার কথার পাশবালিশ! নিজের গোলমালটা ঢাকতে এত কথা আনছো। আমার ব্যাপারে সেদিন তোমার যা ঘটেছিল, তা হল—হঠাৎ বদলে গেল মতটা! আসলে সুখ জিনিসটা বড় মারাত্মক। সিকিউরিটি বড় মনোরম আশ্রয়। কে আর বল জেনেশুনে রোদে ঝাঁপ দেয়। তোমাকে কোনো দোষ দিচ্ছি না। তবে কিনা—আমার ব্যাপারে তুমি সৎ হতে পারো নি সেদিন। তারপর এতদিন পরে তোমার এই গুরুদেব—ধ্যান—এসব আমি তোমার সেদিনকার ছবির সঙ্গে মেলাতে পারি না। গোঁজামিল লাগে।

সেদিন রবি তুমি হেসে হেসে তিনটে কথা একজন মহিলাকে বলেছিলে! বিয়ে না হলে আমি জেদে জেদে অনেক কাজ করে ফেলব। বিয়ে না হলে তোমার কথা ভেবে তপতী আমি ডবল স্পীডে এগোবো। আমায় কেউ রুখতে পারবে না জীবনে। বিয়ে না হলে একবার দেখা হবে যখন আমাদের বাচ্চারা সব বড় হয়ে যাবে। সব কথাই তোমার সফল হয়েছে রবি। আগের জন্মের লেনদেন এরকম করেই শোধ করতে হয়। গুরু-দেব বলেছেন—তোমার জীবন যেন হয় ভগবানের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি।

বলি। আমার জীবন এখন ভগবানের। আমাকে নিয়ে তুমি কেন, কোনো শক্তিমান অথবা নামকরা পুরুষই আর প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাতে পারবে না। সেই প্রবৃত্তিকে নিষ্পাপ সৌন্দর্যের মুখোশ পরালেও তা প্রবৃত্তিই।

রবির পরিষ্কার মনে হল, তপতী কত অশিক্ষিত। অন্ধ গোঁড়ামি আঁকড়ে থেকে আসল জীবনকে তুচ্ছ করছে। আমি একটা রক্ত-মাংসের মানুষ। আমাকে অস্বীকার করে মৃত গুরুদেবের জন্যে বলি হওয়া—সত্যিই বলি। এ একটা নেশা তপতীর। গুরুর নেশা, ধর্মের নেশা কী জিনিস রবি জানে। একবার সুজাতাকে নিয়ে পুরী গিয়েছিল। মন্দিরের বাইরে একখানা ইলোমানা অ্যামব্যাসাডার দাঁড়ানো। ভেতরে কয়েক জন ধর্মপ্রাণা বিধবা ঠাসাঠাসি করে বসেছিলেন। গাড়ির ছাদে মাদুর, তোরঙ্গ, বিছানার সব বাণ্ডিল। একজন বৃদ্ধা গাড়ি থেকে নেমে নোংরা পথের ধুলো হাত দিয়ে সরিয়ে তার ওপরেই পান রেখে সাজতে বসলেন। রবি কোনো আপত্তি করে নি। কারণ ওঁর মতে তীর্থের পথ পবিত্র। ড্রাইভারকে জিগ্যেস করে জানতে পেরেছিল—বর্ধমান জেলার এক গাঁ থেকে সম্পন্ন কয়েকটি পরিবারের মা পিসী মাসী চাঁদা করে বাইরেতে এভাবে তীর্থ করতে বেরিয়েছেন। এই হল গিয়ে নেশা। এখন তপতীর কথায় কোনো আপত্তি করে লাভ নেই।

রবি তোমার হাতখানা দেখি।

হাত এগিয়ে দিয়ে রবি বুঝলো তপতীর হাত কাঁপছে। মুখে বলল, অন্ধকারে ভাগ্যরেখা দেখা যায় না।

কাচভাঙা হাসি ছড়িয়ে তপতী বলল, এই তো ছুঁয়ে দিলাম। খুশী তো!

রবি বুঝতে পারছিল না—তপতীর কোন্‌টা সত্যি। এই বলছে, সে প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাবে না কিছুতেই। আবার ছুঁতে গিয়ে নিজের হাতের কাঁপুনি থামাতে পারছে না। ব্যাপারটা কী!

আজ বিকেলে তোমাকে সুখী করতে পারি নি তপতী?

সুখী করতে তো চাও নি। আমায় দখল করতে চেয়েছিলে। আমার দখল নিতে চেয়েছিলে—

পারি নি। তাই না?

না। পারো নি। ওভাবে হয় না রবি। তারপর একটু থেমে অন্ধকারের দিকে ভীষণ অহংকারী মুখখানা তুলে ধরে তপতী বলল, খানিকক্ষণের জন্যে আমার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলে। অস্বীকার করব না—আমার মনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে শরীরটা তখন অবাধ্য হয়ে নানারকম কাজ করেছিল। মনের সায় ছিল না কিন্তু। তারপর সেই অন্ধকারেই তপতী একরকম ককিয়ে উঠলো। আঃ! শরীর—

খানিকক্ষণ কেউই কথা বলতে পারলো না। জাদুঘরের বারান্দায় যে-ভাবে শীলামূর্তি হেলান দিয়ে রাখা থাকে—প্রায় সেভাবেই অন্ধকারে ভর দিয়ে তপতী বসে ছিল। বসার সেই ভঙ্গিতেই তপতী আপনা-আপনি বলতে লাগলো, যে তোমাকে বলেছে—কেউ পুরোপুরি সৎ না হলে ধার্মিক হতে পারবে না? ধর্মের পথ যে ধরেছে—সে-ই বুঝবে—ডাক পেয়েছে। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য। তিনি যাকে বরণ করে-ছেন—কেবল সে-ই তাঁকে চায়। এসব ভড়ং নয়। যে অসৎ গুরুদেবকে ডাকলে গুরুদেব তাকে আরও বেশী কৃপা করবেন। গুরুদেবের ভক্ত-দের মধ্যে কে সৎ, কে অসৎ সেসব নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন? গুরুদেবের সাধনা দূরে পালিয়ে গিয়ে নয়। সবার মধ্যে থেকেই নিজের প্রবৃত্তিগুলোকে দেখতে হবে। অবিরাম প্রত্যাখ্যান করতে হবে। দেখা আর প্রত্যাখ্যান—মেলামেশার মধ্যে দিয়েই সম্ভব। কারো যদি প্রত্যা-খ্যান করতে অসুবিধা হয়—সে গুরুদেবকে ডাকবে। গুরুদেবই তাকে হাত ধরে টেনে তুলবেন।

রবি নিজেকে মনে মনে বলল, আজ একটি এম-এ পাস অশিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ধম যার গর্বের বিষয়। এবং অবশ্যই নেশা। কিংবা

মনে করে—আহা! আমি ঈশ্বরের তিন কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছে গেছি!

অহম্ তাম্ সর্ব পাপাদ্ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। পুরোপুরি সৎ না হলে সিদ্ধাই থাকে না তোমাকে কে বলেছে?

দোহাই তোমার তপতী। মাফ কর। কত সংস্কৃত বলছো। আমি কোনো কথারই মানে জানি না। সিদ্ধাই মানে কি তপতী? যদি না-ই জানি তাতেই বা আমার কি যায় আসে! আমি জানতাম—ধর্ম মানে মানুষের যা ভালো করে। মানে মানসিক কিছু। যার সঙ্গে সবচেয়ে বড় যোগ একটি জিনিসের। সততার।

তপতী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে যা বলল—পর পর সাজালে তা অনেকটা এরকম দাঁড়ায়ঃ সবার অভিশাপ একত্রে লাগলে তুমি—তোমার পরিবার একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি তখন প্রার্থনা করেও কিছু করতে পারব না। আগুনে হাত দিও না। গুরুদেবের অন্য জিনিস।

আমায় ভয় দেখাচ্ছো কেন তপতী? তপতী হাঁটছিল আর রবি পাশাপাশি অন্ধকারেই পা মেলাচ্ছিল।

আমার বিরুদ্ধে যত পারো বিদ্বেষ পুষে রাখো মনে মনে। আমি তোমাকে কোনোদিন অভিশাপ দিই নি। দেবোও না।

একবার ভয় দেখাচ্ছো। আরেকবার নরম কথা বলছো। এর নাম ধর্ম তপতী? এই তুমি ধর্ম করো? তোমার ওপর আমার কোনো রাগ নেই। এখন আর কোনো স্মৃতিও নেই। এখন যা মনে হয়—এককালে তোমায় চিনতাম। এর চেয়ে বেশী কিছু নয়।

রবি তুমি তো বলতে চাও—তুমি সৎ। ধর্ম করার তোমার কোনো দরকার নেই।

আমি ধার্মিক নই। অধার্মিকও নই। ভগবানকে বলতে চাই—যা আছি—এর চেয়ে যেন আর হীন না হই। দীন না হই। একথা তো মানো—বিনা চেষ্টাতেই মানুষ এক জীবন থেকে আরেক জীবনে একটু একটু করে

সাত্ত্বিক হয়। সৎ হয়। সেজন্যে আলাদা কোনো চেষ্টার দরকার হয় না। আমি সেই দলের। আসলে আমি যে খুব কুঁড়ে। তোমার মতো পরিশ্রমী নই।

কিরকম ?

এই তো বিলেত গেলে পড়তে। বিয়ের দেরি আছে বলেই যে কোনো একটা কিছু পড়তে সাগরপাড়ি ! স্বামী সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরলে। এত বড় বাড়ি করলে। এখন গুরুদেব করছো। চেষ্টা না থাকলে এই ক'দিনের জীবনে এত সব হয় ? আমি তো কিছুই করতে পারি নি !

তোমাকে ধর্মের পথে টানতে চেয়েছিলাম রবি। তোমার দুঃখ আমি বুঝি। তোমার ভালোবাসাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তবে এখন আমি গুরু-দেবের। আপনি, তুমি, তুই, ইউ—এগুলোর কোনো মূল্য নেই। সবাই গুরুদেবের সন্তান।

তাঁবুর কাছাকাছি এসে রবি দাঁড়িয়ে পড়ল। শোন তপতী। আমি অধার্মিক নই। তোমার জন্যে আজ আর আমার কোনো দুঃখ নেই। অনেক কালই নেই। আর তোমাব জন্যে সেই আগেকার মুগ্ধ ভালো-বাসা। সে তো কতকালই নেই।

এখানে তপতী অন্ধকারে ধরে দাঁড়াবার মতো আর কিছু না পেয়ে সরা-সরি রবির বুকে ভর দিয়ে রবিকেই জড়িয়ে ধরল। ধরা গলায় কয়েকটা কথা রবির বুকে ঘষতে ঘষতেই বলল, এবার তো তুমি বললে—আমার দুঃখের জন্যে অমুক দায়ী। তমুক দায়ী। ভাগ্য আমার কি ? ছ্যাঃ ! আমি জীবনে কী পেয়েছি যে ভগবানকে ডাকবো ?

না তপতী। ওসব কথা বলব না। অন্য একটা কথা বলছি। ভালো করে শোন।

অন্ধকারে রবির বুক থেকে মাথাটা তুলে তপতী ওর চোখে তাকালো। সেখানে দুটো অন্ধকার আধুলিমাত্র। এছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না তপতী।

তুমি বলছিলে—সবাই গুরুদেবের সন্তান—। তাই না তপতী ?
হ্যাঁ।
আজ বিকেলে যদি তোমার গর্ভে কোনো সন্তান দিয়ে থাকি ! সে কার ছেলে হবে ? বাবা কে ? তোমার চোখে অবশ্য সবাই গুরুদেবের সন্তান।
অন্ধকারে শুঁয়োপোকা থেকেও মানুষ এভাবে হাত সরিয়ে নেয় না। রবির ওপব থেকে তপতী একদম সোজা পিছিয়ে যেতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। রবি তাকে টাল সামলে দাঁড় করিয়ে দিল।
আমি তখন কিছু মনে রাখতে পাবি নি রবি। এ তুমি কি করলে !
আমার সব মনে ছিল। তুমি কি আনন্দ পাও নি ?
এ কথায় তপতী আকাশে মুখ তুলে তাকালো। সব ক'টা তারাই এখন আকাশে হলুদ চাকতি হয়ে বিঁধে আছে। কোনো আভা নেই কারও। আমার তখনকার কিচ্ছু মনে নেই রবি। থাকার কথাও নয়। তুমি এমন করে দিলে—
রবি বুঝতে পারছিল না—তপতী গাইছে না কাঁদছে। এই গলার স্বর তো তার ভয়ংকর প্রিয় ছিল একদিন।
আমায় একটু দয়া করো রবি, কিছু মনে নেই আমার।
রবির দয়া আসছিল না। ঘৃণাও নয়। আগ্রহ, অনাগ্রহ—কোনোটাই নয়। তপতীর হাত ধরে বলল, রাত হয়ে গেছে। চল।
তাঁবুর হাতায় এসে তপতী এষা ছাড়াও আর যার গলার স্বর শুনতে পেল— তাতে সে তখনি সোজা স্বাভাবিক হয়ে গেল। না হয়ে উপায় ছিল না।
তুমি কখন এলে ?
খানিক আগে। লাস্ট বাসে।
পাজামা, স্যাণ্ডো গেঞ্জি। দেখেই রবি আন্দাজ করে নিয়েছে। সুবিনয়। চোখে চশমা।

সুবিনয় বলল, আপনি তো রবিবাবু। এষা বলছিল। ভেতরে আসুন।
নাঃ! রাত হয়ে গেল। কাল সকালে উঠেই চলে আসবো।
আসবেন কিন্তু। অবশ্যি। অবশ্যি।
চলে আসার সময় রবি দেখলো, তপতী তাঁবুর ঘরের ভেতর থেকে আর বাইরে এলো না।

১১

আমি দেখলাম যে গুরুদেব একটি ভগ্ন মন্দিরের সামনে বসে উপাসনা করছেন। কিছুতেই চোখ খুলছেন না। মন্দিরের চারপাশে অনেক বন-জঙ্গল ছিল। সেই বনে বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং আরো কয়েকজন দেবতার সঙ্গে দেখা হল। দেখা শেষ করে আমি আবার ফিরে এলাম। এসে দেখি গুরুদেব চোখ খুলেছেন। আমাকে দেখে তিনি জিগ্যেস করলেন, তুই কে? এখান থেকে এখুনি পালা।
আমি বললাম, কেন?
গুরুদেব বললেন, জানিস, এই বনে অনেক রাক্ষস থাকে। তোকে খেয়ে ফেলবে।
আমি বললাম, না আমি যাব না।
তখন গুরুদেব কী সব মন্ত্র বলে আমাকে পাঁঠা বানিয়ে দিলেন। রাক্ষসরা আমাকে দেখতে পেয়ে বলি দিল। রাক্ষসরা চলে যেতেই গুরুদেব আবার কী সব মন্ত্র বলে আমাকে মানুষ করে দিলেন। আর বললেন, এবার তুই যা।

তারপর আমি দেখলাম—একটি পর্বত। সেই পর্বতের ভেতরে যেন একটি সাদা পদ্ম। আর পর্বতের চূড়ায় একটি সাপ। সেই সাপের মাথায় একটি উজ্জ্বল মণি। সেই মণি যেন সারা পৃথিবীকে উজ্জ্বল আলো করে

রেখেছে।

এই অব্দি লিখে এষা তারিখ দিয়েছে—১৯শে নভেম্বর।

এসব এষার ধ্যানের অভিজ্ঞতা। ওর ভিশনের খাতাখানা বাঁকাদ থেকে রবির স্যুটকেসে চলে এসেছে। ফেরত দেওয়া হয় নি। দিতে হবে।

কলকাতায় ফিরে একটার পর একটা এত কাজ পড়ে গেছে। নিশ্বাস ফেলবার সময় পর্যন্ত নেই। রবিদের কোম্পানি নানান জায়গায় ডিপ টিউবওয়েল বসাবার সরকারী অর্ডার পেয়েছে। টেণ্ডার বড় হয়ে গেলে সাবকনট্রাক্টও দিতে হচ্ছে।

এখন বেলা বারোটাও বাজে নি। অফিসের সবাই কাজে ব্যস্ত। রবি সাবধানে ভিশনের খাতাখানা ডান হাতের ড্রয়ারে রেখে দিল। এত রাক্ষস, পাঁঠা বলির স্বপ্ন কেন? তপতীদের বাড়িতে হয়তো ওদের ধর্মের জীবনে এখন আমিষ ঢোকা বারণ। হাজার হোক এষা বালিকা। নিশ্চয় মাংস খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। মেয়েটা বড় ভালো।

বাঁকাদহে সেদিন রাতের পরদিন ভোরে তপতীদের তাঁবুতে রবি গিয়েছিল। না গিয়ে পারে নি। সুবিনয়কে দেখার ইচ্ছে তার ছিল। যে অবস্থায় সে তপতীকে তাঁবুতে পৌঁছে দিয়েছিল—তাতে তখন তার পক্ষে সুবিনয়ের মুখোমুখি বসে গল্প চালানো অসম্ভব ছিল। আর রাতও হয়ে গিয়েছিল অনেকটা।

ভোরে যেতেই সুবিনয় যত্ন করে বসিয়েছিল। ভ্রূকুটি ছিল কিন্তু তপতীর মুখে। নয়তো এষা আর তার বাবার মুখ শান্তই ছিল। সুবিনয় সত্যিই শান্ত, স্থির মানুষ। কী করে যে এই মানুষ কোর্টে গিয়ে সওয়াল করে! অন্তত সেই প্রশ্নই রবির মনে জেগেছে।

পূতাস্থি সমারোহ তো শেষ। চলুন কাছাকাছি কোথাও বনভোজন সেরে নিয়ে আমরা সবাই মিলে বিকেলে কলকাতা চলে যাব।

সবাই মানে?

এখানে আমাদের পুরনো চেনাশুনো বলতে তো আপনিই একা রবি

বাবু। আব তো সবার সঙ্গে সমাজে ধর্মেব জীবন কবতে এসে পরিচয। তাও জানাশুনো কাউকে দেখছিনে। এবা সবাই বাঁকুডা, হুগলীব পযসাওয়ালা মানুষ। কোল্ড-স্টোবেজ নযতো ইউনিট ট্রাস্টেব গল্প কববে। জানাশুনো না হলে কি গল্প জমে বলুন?

নিশ্চযই। বলেও ববিব অনিশ্চিত লাগছিল।

এষা বলল, বাবাকে আপনাব ভালো লাগবে। চলুন না। কোনো ভয নেই।

বালিকাব অভযদানে দু'জনই হেসে উঠলো। হাসলো না শুধু তপতী। একবাব যেন সকাল সকাল কলকাতা পাডি দেওযা কতটা জরুবী তা সুবিনযকে মনে কবিযে দেল।

এব পব রবি আব না বলতে পাবলো না। যদি সুবিনয তাকে ভীতু ভাবে। যদি ভাবে প্রাক্তনীর সামনে মুখ তুলে তাকাতে পারবে না বলেই একসঙ্গে যেতে পাববে না - বিশেষত সুবিনযেব সাক্ষাতে। অতএব ডবল উৎসাহে ববি বনভোজনেব যোগাডযন্ত্র কবে ফেললো।

দু'টো গাডি। এষাকে ধবে লোক চাবজন। মাইল চল্লিশেক গিযে জযপুরেব জঙ্গল। সামনে বাঁকুডা। পেছনে বিষ্ণুপুব। অ্যাকবে স্টেশনেব সাবভে টিমেব সঙ্গে একটুর জন্যে দেখা হল না সুবিনয়দেব। তাবা ভোব ভোর বেরিয়ে পড়ে। পেয়ে গেলো তাদেব ঘবগেবস্থালিব পাহাবাদাবকে। ছোট ছোট তিনটে ক্যাম্প। তার মধ্যে বড তাঁবুটাই অফিস। জলেব ড্রাম। পিওন। রান্নার পাকা ব্যবস্থা। পুবো দলটা বিকেল হলে ফেবে। কচি শালগাছ বসিয়ে বসিয়ে জঙ্গলেব স্বাস্থ্য ফিবিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। এষা থাকায় আবও সুবিধে হল। কার না একটা ফুটফুটে ছোট মেয়েকে ভালো লাগে। ওদেরই পিওন আর ববিব ড্রাইভার মিলে কাজ অনেকটা এগিয়ে নিয়ে এলো।

বিরাট একটা ছায়া ধরে দাঁড়ানো নাম-না-জানা বুনো গাছ। ঠাণ্ডা গাছ-তলায় বসে সুবিনয় গল্প জুড়ে দিল। লম্বা সড়কটা বাঁকুড়াব দিকে

হারিয়ে গিয়েছে। সকালের বাতাস মেঘ উড়িয়ে নিয়ে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল—আর অমনি দূরের একটা পাহাড়ের মুণ্ডু স্পষ্ট হয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল।

জানেন রবিবাবু আমরা ধর্ম করি কেন ? ভগবানকে ডাকি কেন ?

রবি কোনো জবাব দিল না। এ কথার জবাব হয় না কোনো। সুবিনয় নিজের উচ্ছ্বাসে কথা বলে যাচ্ছিল। আর রবি তাকে সোজাসুজি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। কত বছর হয়ে গেল—এই মানুষটিকে তার দেখা হয় নি। সুবিনয়েরও তাই। সুবিনয় কথা বলছিল আর রবিকে সোজা চোখে দেখে নিচ্ছিলো। কাল রাতে রবিকে পরিষ্কার দেখা হয় নি তার। বিদেশে থাকতে তপতী অবশ্য ওর কথা বলেছিল তাকে। সে অনেক আগে। তারপর এই। ক'দিন আগে তপতী তাকে জানিয়েছে—রবিকে গুরুদেবের জীবনী পড়তে দিয়েছি। এখন খোলাখুলি তাকিয়ে সুবিনয়ের মনে হল—রবি কি গুরুদেবের যোগসাধনা পড়বে ? পড়তেও পারে। মনে মনে হিসেব করল—তার চেয়ে রবি তিন চার বছরের ছোট হবে। সবে মোটা হতে শুরু করেছে।

রবি দেখছিল, সুবিনয়ের সরল স্বাভাবিক কথা বলার ভঙ্গী। জামা-কাপড়ে খুব সাধারণ।

একটা গল্প শুনুন রবিবাবু। বলতে বলতে সুবিনয় এক কথায় চমকে দিল তপতীকে। তুমি অমন নতুন বউয়ের মতো বসে আছো কেন ? আমাদের একটু চা দাও না। সবাই তো তোমার চেনা। এষা কোথায় গেল ?

এষা তখন ত্রিসীমানায় নেই। নিশ্চয়ই কোনো গাছ দেখছে। নয়তো একজায়গায় দাঁড়িয়ে এই নির্জন জঙ্গলের স্তব্ধ ভাবটা মনে মনে তুলে নিচ্ছে। নতুন কোনো সুরেরই মতো। অবশ্য এ ঠিক খাঁটি জঙ্গল নয়। জঙ্গলের আদল মাত্র। লম্বায় তিন চার মাইল হবে। চওড়া কতটা বোঝা যাচ্ছে না। একদিক থেকে গাছ কেটে নিয়ে গেছে লোকে। আরেক-

দিক থেকে গাছ বসিয়ে চলেছে সারসার। চোর-পুলিশ খেলা।

চমকানো তপতী যখন চা নিয়ে এলো—স্থবিনয় তখন তার গল্পের শেষে পৌঁছে গেছে। শেষে বলল, ভগবান হলেন রাজার রাজা। রবির কাছে পরিচিত রূপকথার মতো লাগলো।

বরং স্থবিনয়কে তার ভীষণ ভালো লাগতে লাগলো। তপতীর চেয়ে একদম অন্য সুরে গুরুদেবের কথা বলে। ধর্মের কথা বলে মনেই হচ্ছিল না। শেষে স্থবিনয় বলল, একদিন দেখবেন—কিছুই আর ভালো লাগছে না। সবই বাসি হয়ে গেছে। তখন ? তখন কি করবেন ? ধ্যান ? আত্ম-হত্যা ? তীর্থযাত্রা ? ভগবানের দরজায় আমরা সবাই কিন্তু শিশু। তিনি ইচ্ছে করলে—

—দেখুন। ভগবানের আমি বিশেষ কিছু জানি না ! গুরুদেবের যোগ-সাধনা সবে পড়ছি। তাছাড়া আমি তো ভীষণ অর্ডিনারি।

এতক্ষণে তপতী ফোঁস করে উঠলো। মোটেই না। তুমি বেশ ধার্মিক লোক।

একদম না তপতী। আমি ভগবানের কিছু জানি না। কিন্তু ভগবানের কোনো সাবস্টিটিউট হাতে নেই বলে—বিদ্যাবুদ্ধি নেই বলে—সে ভদ্র-লোককে কোনোদিন চ্যালেঞ্জ করার সাহস হয় নি।

মিশে দেখো। ভগবান ভদ্রলোক খুব ভালো। তোমার ভেতরে তখনই আমি নানা চিহ্ন দেখেছি—

এখানে স্থবিনয় সবাইকে একটু হাসিয়ে দিল। তখন ? মানে সেই তখন ?

তপতী আদুরে গলায় বলল, রাখো তো এখন ঠাট্টা। তারপর বেশ গাঢ় গলায় বলল, তখন রবির ভেতরে একরকমের বিস্ফোরণ হত। ও আমার জন্যে কেঁদে ফেলতো—

তাই বুঝি রবিবাবু !

একদম বাজে কথা। লজ্জা ঢাকতে রবি অন্য কথায় গেল। দুপুরেই

কলকাতা স্টার্ট দিলে কেমন হয়?

এর ভেতরেই তপতী বলে বসলো, তুমি তো চিঠিতেই আমাকে ভগবান বলতে।

সুবিনয় বলল, ছিঃ! তপতী। ওভাবে বোলো না। তোমাকেও আমার গোড়ায় গডলি লাগতো।

আমার চিঠিগুলো কি করেছো রবি?

শুনলে তুমি ব্যথা পাবে তপতী।

বলোই না। ওসব আমাদের আর স্পর্শ করে না। সে জীবন থেকে কত দূরে সরে গেছি।

সুজাতা তোমার চিঠিগুলো উল্টেপাল্টে দেখতো। আর গম্ভীর হয়ে যেত। তাই একদিন জড়ো করে আগুন দিয়ে দিলাম। ওর সামনে। বিলিতি এয়ার মেল। আগুন পেয়ে ফুলে ফেঁপে উঁচু হয়ে উঠেছিল।

সুবিনয় গাছতলার আবহাওয়া হালকা করতে গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, ছাইয়ের রং মনে আছে রবিবাবু?

রবি একটুও না হেসে বলল, ধোঁয়াটে। ধূসর। ছাই ছাই।

লাঞ্চের বেশ আগেই বেরিয়ে পড়ল রবি। গাড়ি নিল না। পায়ে হেঁটে কলকাতাকে অনেক বেশী দেখা যায়। সময় সময় ভালোও লাগে বেশী।

সকাল সকাল অফিসে আসতে হয় বলে রবি শুকনো কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। অফিসের পথে বুবুকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে রবি যখন অফিসে ঢোকে তখন সারা অফিসবাড়ি একদম পুজোবাড়ির তকতকে চেহারা নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করে। হাঁটতে হাঁটতে তার মনে পড়ল, কালই রাতে তপতীর দেওয়া একখানা বই নেড়ে-চেড়ে দেখতে দেখতে সে সত্তর পাতা পড়ে ফেলেছে। উপন্যাসের চেয়েও ইন্টারেস্টিং। এক জায়গায় গুরুদেব লিখছেন, গোদাবরীর তীরে তিনি তিন দিকে পাহাড়ে

ঘেরা এক উপত্যকায় শ্বেতপাথরের ভাবতী মূর্তি দেখলেন। মূর্তির ভাস্কর্য, সৌন্দর্য তাঁকে টানে নি। টেনেছিল মূর্তির ভেতরকার মাতৃশক্তি। সেখানেই গিরিগহ্বরে এক যোগী সেদিনকার যুবক গুরুদেবকে যোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আগে মন থেকে সব চিন্তা ঠেলে বের করে দাও। মন খালি করে দাও। এ যেন অনেকটা—ঘরের সব আসবাব বাইরে বের করে দিয়ে মেঝেতে শতরঞ্জি পাতার মতো। তারপর সেই অবস্থায় গুরুদেব তিন দিন ঊর্ধ্ব নেত্র হয়ে রইলেন। সঙ্গে সেই শিক্ষক যোগী। দু'জনে কলের পুতুলের মতো হাত দিয়ে সামান্য আহার গ্রহণ করেন আর অবিরাম ঈশ্বরচিন্তা। তখন দেহ হাল্কা লাগে। গায়ের বাদামী রং গৌর হতে থাকে। শরীরে বল আসে। অতীতের অনেক কথা স্মরণে আসে। স্মৃতি প্রখর হয়।

লাঞ্চের সময় রবি এক এক দিন এক একটা দোকানে ঢোকে। কলকাতায় এখন ব্যাঙ্ক, লণ্ড্রী আর খাবারের দোকান বেড়েই চলেছে। চেনা তিনটে দোকান পেরিয়ে একটা নতুন চীনে দোকানে ঢুকে পড়ল। ভেতরে আলো-আঁধারি। কাগজে ঢাকা ইলেক্‌ট্রিকের ঝাড়লণ্ঠন। কী খাবারের অর্ডার দেবে ভেবে পেল না। সবই ব্লটিং পেপার লাগে। কোনো ক্রমে একটা চিকেন স্যুপ আর খানিকটা মাছ সেদ্ধ খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কী যে ভালো লাগতে পারে তা জানা যাচ্ছে না। আগে কত জিনিসে স্বাদ পেত রবি।

পোষা গরু ঘোড়ার মতো রবি অজান্তেই হাঁটতে হাঁটতে ঠিক অফিস গেটে এসে হাজির হয়েছে। ঠিক করতে পারছিল না—অফিসে যাবে কিনা। একটা কিছু বলে দিলেই হয়। কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না। এতদিনের চাকরি রবির। একটা নতুন কোথাও যদি তার স্বাদ তৈরি হত। যেখানে সে আকর্ষণ বোধ করতে পারতো। কিন্তু এখানে কোথাও কোনো স্বাদ পায় না রবি।

হ্যাঁ। সুজাতা।। তার বিবাহিত স্ত্রী। ভয়ংকর ভালো লোক। কয়েক-

দিন আগে একটা আশ্চর্য কথা বলেছে। বিকেলের দিকে। রবিকে বলেছিল—তোমরা পুরুষরা মেয়েদের কথা যখন ভাবো—তখন কখন বুকের আঁচল খসে গেল, কার উরুতে কে হাত রেখেছিল—এসব নিয়েই মাথা ঘামাও। আমরা দেখি—মেয়েটি কেমন—ভেতরে কি আছে। স্বভাব কি কায়দার।

সুজাতাকে কেমন লাগে? ভালো। কিন্তু, ভীষণ একটা আকর্ষণ—যা কিনা সব কাজকর্ম স্বাদু করে তুলতে পারে—এমন কোনো ব্যাপার সুজাতার সঙ্গে আজকাল নেই ববির।

আর তপতী? কোনো আকর্ষণই পায় না রবি। তপতী কিন্তু এখনো মনে করে - রবি সেই আগের মতোই তার জন্যে পাগল হয়ে আছে। আশ্চর্য! সে নিজে যে পালটে গেছে—এটুকুও কি তপতীর চোখে পড়ে না।

স্যার! আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। শুনলাম লাঞ্চে বেরিয়েছেন। লিফটের গোড়ায় সেই দাড়িওয়ালা লোকটা দাঁড়িয়ে। পায়ে মোকা-সিন। গায়ে সাদা টেরিলিনের পাঞ্জাবি। সাদা-কালো চাপ দাড়ি। তেমনি ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট ভাবী ভ্রূ। ঈষৎ লালচে গাল। কবজিতে দামী ঘড়ি। পাকা কনট্রাক্টরের চেহারা।

কি দরকার বলুন?

আপনি তো জানেন—আমি টেণ্ডার দিয়েছি। বলাগড়ে ডিপ্ টিউব-ওয়েল বসানোর কাজটা আমায় দিন। দেখুন কেমন করি। সিগারেট নিন।

থাক। একটু আগে খেলাম।

লিফট আসতেই রবির সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও ঢুকে পড়ল। তারপর তার টেবিলেও চলে এলো। মুখে গায়ে পড়া আন্তরিকতা। ঠিকাদারদের যেমন হয়।

আপনি আমার কাজের রেকর্ড দেখুন। মুণ্ডেশ্বরীর তীরে তিনটে রিভার লিফট পাম্প বসিয়েছি।

লোকটির নাম বোধহয় বিনোদবাবু। সে রকমই তু' একবার শুনে থাকবে রবি! এ রকম নাছোড়বান্দা কিছু লোক তো সাব-কনট্রাক্টের জন্যে এসেই থাকে।

পড়তি বিকেলের অফিস। রবির চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালে এত উঁচু থেকে এখন ময়দান, ভিক্টোরিয়া, সাবুগাছের সারিকে বিদেশী ক্যালেণ্ডারের ছবি মনে হবে। লোকটা যে কখন উঠবে তার ঠিক নেই। মুণ্ডেশ্বরীতে ডিজেল পাম্প বসালেন? জলেব ডেলিভারী কেমন বিনোদবাবু?

বিনোদ নয়। আমার নাম বিনয়। বিনয় বসু। আমার নামটা আপনার মনে থাকে না রবিবাবু।

চেহারাখানা কিন্তু ভুলি নি দেখুন।

আমার চেহারা কি ভুলবার মতো মিস্টার গুহ?

তা ঠিক। বলে রবি চুপ করে গেল। বিনয় বসু লোকটা আজ তিন চার বছর মাঝে মাঝেই তার সামনে উদয় হয়। স্বাস্থ্য, দাড়ি, চেহারার জেল্লা নিয়ে লোকটা সত্যিই রীতিমতো দেখবার মতো। লম্বা-চওড়া রঙদার মানুষ।

চলুন না। কাছে পিঠে ঘুরে আসি কোথাও। যাব [illegible] আসবো। ঘণ্টাখানেকের ভেতর।

রবি জানে, এ সব হল গিয়ে কু-প্রস্তাব। বাইরে নিয়ে গিয়ে এরা খাওয়ায় দাওয়ায়। কখনো আবার জিনিসপত্তর উপহার দেয়। আগে আগে রবি যে এমন প্রস্তাবে গা ভাসায় নি তা নয়। তবে এই বিনয় বসুর সঙ্গে তার কোনোদিন বেরোনো হয় নি। মুখে বলল, না থাক। অনেক কাজ জমে আছে।

চলুন তো মশাই। এই তো আপনাদের ঘুরে বেড়াবার সময়। কত কি দেখবেন। তা না ঘরকুনো হয়ে বসে আছেন। চলুন।

কোথাও মন লাগাতে পারছিল না রবি। বিনয় বসুর সঙ্গে বাইরে

বেরিয়ে এসে দেখলো—লোকটির ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার স্বয়ং বিনয়। রবিকে পাশে বসতে বলে তিন মিনিটের ভেতর পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল।—কাজে বেরোলে আমি নিজেই গাড়ি চালাই। তবে দিনের বেলা। রাতে ভালো দেখতে পাই না।

কোথায় যাচ্ছি আমরা বিনয়বাবু?

লিফটে উঠতে উঠতে বিনয় বসু বলল, চলুন না। দেখবেন এখুনি।

এখানে ফ্ল্যাট কিনেছেন নাকি?

মানি-মার্কেট টাইট। টাকার টান পড়ায় এক সিন্ধী বেচে দিলে। লোকটির ছিল জামাকাপড়ের বিজনেস।

হোয়াইট করবেন কি করে? এ তো অনেক টাকার ফ্ল্যাট।

কাগজপত্রে দেখলাম—লোকটা সাত বছর আগে দশ হাজার টাকার হুণ্ডি কেটেছিল আমার কাছে। সেই টাকা সুদে আসলে তিরিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তখন বাধ্য হয়ে দেনা শুধতে আমায় বেচে দিল। আরও চল্লিশ দিলাম ওকে।

বেশ ভালো রাস্তা তো বের করেছেন। কিন্তু কোনো ক্লু বেরোয় যদি?

যখন বেরোবে তখন দেখা যাবে। উকিলরা আছে কি করতে? এই যে এসে গেছি? কুন্দ?

দরজা আধ ভেজানো ছিল। ভেতরে ঢুকে বিনয় আবার চেঁচালো। কোথায় গেলে গো কুন্দ?

বিরাট লিভিং রুমের দেওয়ালে প্রমাণ সাইজের ভারী পর্দা ঝোলানো। দেওয়ালে দেওয়ালে কনসিলড্ আলোর জায়গা থেকে দিনের বেলায় সারা ঘরে নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে। তেমনই হারিয়ে যাওয়া একটা আলোর জায়গা থেকে খুট্ করে শব্দ হল। সেখান থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে আসতে বোঝা গেল—ওটাই পাশের ঘরে যাবার দরজা।

কখন এলেন বিনুদা? ওমা! এ কাকে এনেছেন?

আস্তে আস্তে পরিচয় পাবে। মস্ত লোক। গুণী মানুষ। তোমার গান

শুনবেন।
রবি জানে, তাকে মস্ত গুণী বলে তোয়াজ করা হচ্ছে। যে বলছে আর যে শুনছে—সবাই জানে একদম বাজে কথা। তাই আর আপত্তি করলো না।
গলা তো ভালো নেই।
তা যা হয় হোক না একখানা। ভালো কথা কুন্দ—সদর খোলা রেখে ভেতরে ছিলে ?
সোডা আনতে টাকা দিলাম লিফটম্যানকে। কিছু খান আপনারা। বলতে বলতে মহিলা লাগোয়া তকতকে কিচেনে চলে গেল। রান্নাঘরের আধখানা বসে বসেই দেখা যায়। সেখানে মানুষপ্রমাণ টু ডোর ফ্রিজ দাঁড়িয়ে। কতজনের সংসার ?
জিন দিই ?
আমি এখুনি ফিরবো। বিনয়বাবুকে দিন বরং—
আমি তো নিচ্ছিই। আপনিও নিন রবিবাবু। কুন্দর ঠুংরির সঙ্গে দারুণ জমে যায় জিন।
কুন্দই ঢেলে দিয়ে লাইম মেশালো। দামী সিল্ক প্রিন্টের শাড়ি। পায়ে দুই স্ট্র্যাপের চটি। গোল করে কাটা নখ নেল পালিশে বেদানার দানা হয়ে আছে। ঝুঁকেপড়া কুন্দকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল—ব্লাউজ পরার সময় পায় নি। দামী কোম্পানির ব্রা'র স্ট্র্যাপ আঁচল ফসকে বেরিয়ে গিয়ে কাঁধে এঁটে বসেছে। বোঝাই যাচ্ছিল, মহিলা সারাদিনে অন্তত ঘণ্টাতিনেক শরীরের যত্ন নেয়। ঠোঁট যেন পেনসিল স্কেচে পরিষ্কার আঁকা।
রবিরা দু'ঢোঁক না খেতেই কুন্দ আসন করে বসে খোলা গলায় তান দিল। সমে পৌঁছতেই বিনয় বসু নিজের উরুতে শব্দ করে থাপ্পড় মেরে কেয়াবাত জানালো। জিনের মজা—দেরিতে ধরে। ধরলে আর নিস্তার নেই। কুন্দর গলা দিয়ে বিলম্বিত লয়ে সুর স্বর গড়িয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে

আসছিলোই। এক সময় তার বিনুদা ক্রেডিট নিতে রবির দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন কিনা! বলেছিলাম না? আপনার আজ আর অফিসে ফেরা হচ্ছে না।

সে তো বুঝতেই পারছি।

এমন গলা আর পাবেন না রবিবাবু। আমি সাত বছর ওস্তাদ রেখে ওকে শিখিয়েছি।

রবির তখনো তেমন ধরে নি। তবু জিগ্যেস করা যায় না—কুন্দ আপনার কে এমন যাকে ওস্তাদ রেখে কালোয়াতি গান শেখাতে হল? তাই শুধু বলল, খুব দরদ দিয়ে গাইছেন।

নাচেও খুব সুন্দর।

গান থামিয়ে কুন্দ বলল, দোহাই তোমার বিনুদা। এখন কিন্তু নাচতে বোলো না।

তাতে কি কুন্দ। তানপুরা ছাড়াই যেমন গাইলে—তেমনি ঘুঙুর মৃদঙ্গ ছাড়াই নাচবে।

মাফ করো বিনুদা। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না ক'দিন—

না হয় নাচলেই একটু। এমন গুণী লোক রোজ আসবেন না। মস্ত মানুষ।

তুমি তো মস্ত মানুষ ছাড়া কাউকে এখানে আনো না!

না। না। সে রকম নয় কুন্দ। এ একদম আলাদা।

রবি তাকিয়ে দেখলো—লিফটম্যান কখন এসে সোডার বোতলগুলো রেখে গেছে। সে আচমকা উঠে গিয়ে দুটো সোডার বোতল নিয়ে এসে বসে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে বিনয় বসু হা হা করে উঠলো। কী হচ্ছে কুন্দ? ইনি তোমার গেস্ট। খাবার-টাবার কিছু দাও।

কুন্দ অসহায়ের ভঙ্গিতে তাকাতেই তার বিনুদা টক করে উঠে দাঁড়াল। জিনের দরুন একটা আলগা হাসি দাড়ির ওপর দিয়ে উথলে উঠেছে।

অনায়াসে বড় বড় পা ফেলে পঞ্চান্ন কি আটষট্টি বছরের বিনয় বসু ফ্রিজের দিকে হেঁটে গেল। খানিকটা সসেজ কেনা ছিলো তো। আছে না কুন্দ?

ঠিক তো। ধরাই আছে। বোসো না এসে। আমি এনে দিচ্ছি।

আধো উঠে বসা কুন্দর ভঙ্গী এখন একেবারে একখানা বিখ্যাত ক্যালেণ্ডারের কথা মনে করিয়ে দিল রবিকে। সে ছবিতে একজন নর্তকী হাঁটু ভেঙে বসে পায়ের পায়জোর খুলছিল। কত বয়স হবে? এখনো নাচতে পাবে। ছোট কপালের মুখখানায় আধপাকা ভাবটা আরও আকর্ষণ এনেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বিনয় সসেজ ভাজছিল। আর কথা বলছিল গ্যাসের উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে। এখুনি আসছি রবিবাবু। কুন্দ তুমি একটু ছাখো না মিস্টার গুহকে। আমি এলাম বলে।

তুমি বেখে দাও না বিনুদা। আমি এনে দিচ্ছি—

রবি আস্তে বলল, ভাজছে যখন—ভাজতে দিন না—

খচ করে ঘুরে তাকালো কুন্দ। কোনোদিন তো ভাজাভুজি করে নি। আজই দেখছি—

তার কারণ বোধহয়—আমি তো একজন মস্ত লোক! তাই স্পেশাল খাতির!

হবে! আরেকটা ছোট করে দিই?

পরে নিয়ে নেব।

এখানটায় কুন্দ বলে বসলো, আমার যেন চেনা লাগছে আপনাকে—গত জন্মের!

হতে পারে। নাও হতে পারে। হয়তো এ জন্মেই কোথাও দেখে থাকবো।

ও রকম চেনা মনে হয় এক একজনকে। কোথায় দেখেছেন আমাকে? আমার তো কোথাও বেরোনো হয় না মিস্টার গুহ।

একদম বেরোন না ?

না। গলা সাধি। গাই। নতুন কাজ তুলি গলায়—

নাচেন কখন ?

কোথায় আর নাচি। এক আপনারা যখন নাচান সে কথা আলাদা।

আপনাকে বুঝি নাচতে হয় মাঝে মাঝে ?

বিমুদার খেয়াল হল তো কথা নেই। তখুনি নাচতে হবে। নাচগান এত ভালোবাসতে পারে! আচ্ছা রবিবাবু, আপনি কি কখনো পাটনায় ছিলেন ? গঙ্গার দিকটায় ?

কস্মিনকালেও না।

তাহলে বেহালায় ?

পাটনার পরেই বেহালায় ? বেশ তো বলেছেন ! দু' একবার গিয়ে থাকবো হয়তো। মনে নেই একদম।

একবার ভালো করে মনে করে দেখুন না।

না। একদম মনে পড়ছে না।

বিনয়ের সঙ্গে রবি যখন বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল—কলকাতায় তখন সন্ধ্যা। ফুটপাথ পেরিয়ে গাড়িতে ওঠার মুখে মনে পড়ল, কুন্দর ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতো পরার সময় সে উলটো দিকের দেওয়ালে মাত্র একখানা ফটো দেখেছে। একটি চার পাঁচ বছরের সুন্দর ছেলের ছবি।

লিফটের গোড়ায় এসে কুন্দ বলেছিল, আবার আসবেন কিন্তু। ভালো করে গান শোনাবো।

নাচ দেখার ইচ্ছে থেকে গেল।

সে একদিন হবে'খন।

১২

সুজাতা ছাদ থেকে গুনে গুনে ন' রকমের আচারের বয়াম তুলে এনে ছায়ায় রাখলো। তারপর তেলে ডোবানো একটা টসটসে লেবু নিয়ে ছাদের লাগোয়া রবির ঘরে গিয়ে ঢুকলো। হাঁ করো তো। কেমন টেস্ট হয়েছে বলতে হবে।

ভালোই তো।

গরমকালটা বুবুদের ভাতের পাতে দেব। তাহলে দু'টো বেশী খাবে। গুনে গুনে চল্লিশটা লেবুও আচারে দিয়েছি।

বৈশাখের আর ক'দিন বাকী। বিকেলের দিকে সুন্দর হাওয়া দেয়। ক'দিন আগে ভালো বৃষ্টি হয়ে গিয়ে নিচের বারান্দা থেকে ছাদে উঠে আসা বোগেনভেলিয়ার পাতাগুলো কালো হয়ে উঠেছে। বহুদিনের গাছ। লতানো কাণ্ডের ওপরকার বাকল বয়সের চাপে ফেটে বেরিয়ে পড়েছে। ঠিক সেখানটাতেই একটা রোঁয়া ওঠা কাক বারবার এসে বসছে। বসেই চুপ করে রবির দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘর থেকে হাত তুলেও রবি কাকটাকে তাড়াতে পারে নি। একদম ভয় পায় না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরেই রবির সঙ্গে কাকের এই কাণ্ড চলছিল। খোলা দরজার ফ্রেমে শুধু এই ছবি। রাগে গা রী রী করে উঠছিল রবির। উঠে গিয়ে যে তাড়িয়ে দিয়ে আসবে, সে শক্তিও পাচ্ছিল না শরীরে।

আমার গা-টা একবার দেখবে সুজাতা?

ওমা! এ যে গা পুড়ে যাচ্ছে। জ্বর বাধালে কি মনে করে?

ইচ্ছে করে বাধাই নি তো। ক'দিনই শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। একটা কথা শোন সুজাতা। ওই কাকটাকে তাড়িয়ে দাও না। ফিরে ফিরে ওখানেই বসছে। আর আমাকেই দেখছে মন দিয়ে।

তাড়াতে গিয়ে সুজাতা দেখলো—গাঢ় হলুদ ফুলের গা ঘেঁষে ঘন সবুজ পাতার ছড়াছড়ি। তার ভেতর চকচকে কালো রঙের কাকটা বসে আছে। তার রোঁয়া-ওঠা ঘাড় ডানদিকে কাত করে রবিকে দেখছে মন দিয়ে। কাকটাকে তিনটে চারটে ছাদ পার করে দিয়ে এসে সুজাতা দেখলো রবি টেবিল থেকে উঠে বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আল-গোছে পা দু'খানা টান টান করে দিল সুজাতা। পাতলা সুজনিটা গলা অবদি টেনে মাথার কাছের জানলাটা আটকে দিল। দেবার সময় দেখলো—কাক তার পুরনো জায়গায় আবার এসে বসেছে। একদম ছবির মতো। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। তপতীর ডান চোখের পাতা কেঁপে উঠলো।

ফিরে বিছানায় তাকাতেই সুজাতার চোখে পড়ল, রবির হাতে আধ-খোলা বই। বইখানা তুলে নিল। তপতীর বই। গুরুদেবের যোগ-সাধনা। বোঝাই যাচ্ছিল, রবি পড়তে পড়তে বইখানার আধখানারও বেশী পড়ে ফেলেছে।

সুজাতা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার মুখে জানলোও না।—রবি তখন জ্বরের ঘোরে গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলছিল। বড় শান্ত মধুর রূপ মানুষটির। তিনি রবির দিকে তাকালেন। রবির ভেতরটা ঠাণ্ডা ছায়ায় ভরে গেল। কি আরাম।

আমার এখন অনেক টাকা গুরুদেব।

জানি। বিনয় দিয়েছে তো।

আপনি তো সব জানেন। আমার গায়ের জ্বরের মতো জ্বালাপোড়া হয়েছে কেন বলতে পারেন? সব সময়?

নিজের যেটুকু দরকার শুধু সেটুকু নিয়ে বাকীটা ঈশ্বরকে ফেরত দিয়ে দিতে হয়। আরো আমোদে থাকব ভাবলে আমোদ ফিরে যায়।

ভালো করে তাকালো রবি। গুরুদেবের মাথার পেছনে আলোর চালি। যাকে বলে—আভা। ঠিক তাই।

আমি এখন এতগুলো টাকা নিয়ে কি করবো ?

বিনয়ের টাকা তো। ও তোমায় আরো দেবে। তোমার দৌলতে পাচ্ছেও যে অনেক।

ঘুম ভেঙে গেল রবির। হাতের কাছের বইখানা নিয়ে আবার পাতা ওলটাতে লাগলো। সারাদিনের কাজের ভেতর ইদানীং তাব প্রায়ই মনে হয়—কী যেন বাকী থেকে গেল। বাকী থেকে যাচ্ছে। একবাব পাতা ক'খানা ছুঁয়ে দেখলে মন্দ লাগে না। জানলাটা খুলে বাইরে তাকাতেই কলকাতার রাস্তার ছবি ছায়াছবির মতো চোখের সামনে দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। সবই অবাস্তব। ছায়াছবি মাত্র। বইয়ের একজায়গায় চোখ আটকে গেল।

ভগবানের সন্তান হলেও এমন কোনো সাধক নেই যার মধ্যে প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দোষ নেই। এই সব যখন টের পাওয়া যায় তখন প্রত্যাখ্যান করতে হয়।·· একটাই জীবনের শিক্ষা যে পৃথিবীব সব কিছু তোমাকে পরিত্যাগ করতে পারে—একমাত্র ভগবান কখনো পরিত্যাগ করেন না—যদি তুমি তাঁর দিকে ফিরে থাক।

বইখানা বন্ধ করে বাইরে তাকিয়ে থাকলো রবি। এখন সে কোনো জিনিসেরই মানে বুঝতে পারছে না। কুন্দব সেদিনকার ঠুংরি লয় বিস্তার এখনো তার মাথার ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

সুজাতা ওপরে উঠে এসে রবিকে দেখে বলল, এই ঘুমোলে—এই জেগে উঠছো—কি ব্যাপার ?

কিছু ভালো লাগছে না। একটু কাছে এসে বসবে ? বসবে ?

সুজাতা এসে রবির পাশে বসল। পিঠে হাত রেখে বলল, বাঁকাদ থেকে ফিরে অব্দি তোমার যে কি হয়েছে। সবসময় চুপ করে বসে থাকো। কি হয়েছে তোমার ? সেই হাসি নেই মুখে।

রবি আচমকাই বলল, আমার যদি এখন একটা ছেলে হয়।

ছেলে তো তোমার আছে। তারপর মাথা নামিয়ে সুজাতা বলল, আমা-

দের এখন আর সন্তান দরকার নেই। ভগবান তো দিয়েছেন।

ধর অন্য কোথাও যদি একটা ছেলে পাই—

ছেলে কি সিগারেট! অন্য দোকান থেকে নিয়ে আসবে। পরের ছেলে মানুষ করার বয়স আর নেই আমার।

খুব পরের ছেলে নয়।

কার ছেলে গো? বাবা মা খাওয়াতে পারছে না?

রবি চুপ করে থাকলো। কতকাল তার আর সুজাতার মাঝখানে বিছানায় অয়েলক্লথে কোনো বাচ্চা শোয় না। যার জন্যে মাঝরাতে বিছানায় উঠে বসতে হয়।

নিচে যাবার সময় সুজাতা বলল, সেলাইকলের একটা ববিন কিনতে যাবো। তোমার কিছু আনতে হবে?

বুবু কোথায়?

নিচে। ডেকে দেব।

থাক।

সুজাতা বেরিয়ে যাবাব খানিক পরে বুবু ওপরে ছুটে এলো। বাবা তোমাব ফোন।

রবি গিয়ে ফোন ধরতেই ওপাশে তপতীর গলা ভেসে এলো। মিস্টাব গুহ আছেন?

রবি। আমি তপতী।

এপাশ থেকে রবি ক্লান্ত তপতীর বড় বড় নিশ্বাস ওঠা পড়ার শব্দও ফোনে শুনতে পেল।

বল। শুনতে পাচ্ছি।

এ তুমি কি করলে!

কেন? কি হল আবার?

আমি ফোনে বলতে পারছি না রবি।

জানি। তুমি মা হবে তো। এ তো জানা কথা! খারাপ কি! আমি তো

কিছুই দিই নি কোনোদিন তোমাকে। নাহয় থাকলো একটা চিহ্ন।

এভাবে বোলো না রবি। যে করেই হোক বন্ধ করতে হবে।

তা কেন! আমরা সবাই ভগবানের সন্তান তপতী।

উঃ! তুমি এতটা স্বার্থপর—এতটা নিষ্ঠুর তুমি, তা ভাবতে পারি নি রবি। একটা কিছু কর। এখনো সময় আছে।

রবি ফোনটা নামিয়ে রাখলো। তারপর আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলো। নিজের খাটে বসে পা ছড়িয়ে দিল। নাক দিয়ে গরম নিশ্বাস বেরোচ্ছে। আহা! শিশুটির তো কোনো দোষ নেই। মায়ের অনিচ্ছায় সে পৃথিবীতে আসতে চাইছে। পিতা নিস্পৃহ। ক্ষোভ, রাগ থেকে রবি তার জন্মের বীজ বুনেছিল। অন্তত কোনো ভালোবাসা ছিল না—একথা রবি এখন হলফ করে বলতে পারে।

রাতে লেবুবার্লি খাওয়ার সময় সুজাতাকে রবি বলল, আমরা তো একটি শিশুকে দত্তক নিতে পারি।

খুব খোকার শখ হয়েছে! হাসপাতালের কার না কার বাচ্চা—সে আমি নিতে পারব না।

জানাশুনো জায়গা থেকেও তো আনা যায়।

এত বাচ্চার শখ হয়েছে কেন তোমার? টুনি তো এখনো ছোট। আমি কিন্তু আর নতুন করে মা হতে পারছি না এ বয়সে।

রবি পরিষ্কার কোনো কথাই বলতে পারলো না। কী বলবে তাও সে এখনো জানে না।

ঘড়িতে রাত স'নটা হবে। ঠিক এই সময়ে এষা তার নতুন ধ্যানের খাতা খুলে লিখতে বসেছে। সুবিনয় কোর্টের কাগজ দেখছিলো। তপতী লবির লাগোয়া বাথরুমের মেঝেতে উবু হয়ে বসে বমি করতে লাগলো।

এষা তখন লিখছিল—

বিশুদ্ধ চক্রের কাছাকাছি জায়গায় আমার মা হাত দিয়ে কম্পন সৃষ্টি

করার ফলে আমি দেখতে পেলাম—

(১) ফিকে নীল রঙের আকাশ।

(২) লাল রঙের তারা।

(৩) একটি ফুল।

(৪) ফাঁকা মাঠ।

(৫) একটা ভগ্ন মন্দিরের চুড়ো আলোয় ভরে উঠেছে। মন্দিরের ভেতর কালীমূর্তির চোখ থেকে আগুন বেরুচ্ছে।

(৬) চারদিকে কুয়াশার মধ্যে দুটি চোখ।

(৭) একটি সবুজ রংয়ের ইস্কাবন।

(৮) সমুদ্রের উপর দিয়ে অনেক পাখি উড়ে যাচ্ছে।

(৯) হলুদ রঙের গোলাপ।

(১০) একটা লাল রঙের মোটর গাড়ি। তার গায়ে অনেক রকমের চোখ আঁকা।

লিখতে লিখতে এষা তার গলায় হাত দিল। ধ্যানে বসলে মা তার গলার কাছে অদৃশ্য বিশুদ্ধ চক্রের জায়গায় হাত দিয়ে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তপতী জায়গামতো কাঁপিয়ে দিয়ে কম্পন সৃষ্টি করতে পারে। এষা তাই চোখ বুজতেই অনায়াসেচারদিকে কুয়াশার মধ্যে দু'টি চোখ দেখতে পেয়েছে।

চারদিকে কুয়াশার ভেতর দুটি চোখ এঁকে ফেলল পাতা জুড়ে। তারপর কোণের দিকে উঁচুতে ওরই ভেতর গাঢ় করে সবুজ রঙের একটা ইস্কাবন আঁকলো।

উঠে গিয়ে বাবাকে দেখাতেই সুবিনয় বলল, খুব ভালো এঁকেছো। তোমার মাকে দেখাও।

এষা খুঁজে খুঁজে মাকে পেলো না সারা বাড়িতে। তখন চারতলার কাচঘরে উঠে গিয়ে তপতীকে দেখতে পেয়ে তো অবাক্!

এষার অবাক্ চোখের সামনে তপতীরই লজ্জা করছিলো। মেয়ের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছিল না। এষা দেখলে, মা কাচঘরের কোণে পড়ে

থাকা বাতিল ড্রেসিং টেবিলটার মাথার আলো জ্বেলে বসে চুল বাঁধছে। চোখ দু'টো ভারী। ম্যাজেণ্টা রঙের ব্লাউজের সঙ্গে মিলিয়ে ম্যাজেণ্টা রঙের টেরিসিল্ক। তার পাড় প্রিণ্টের হলেও জরি জরি ভাব।

চোখে কাজল। মা তোমার এসব শাড়ি জামা কোথায় ছিল এতদিন ?

তোলা ছিল। বলতে বলতে তপতীর ভয় হল। এ মেয়েটি তার মেয়ে। কিন্তু জন্ম থেকেই তার সখী। ও জন্মে ইস্তক দেখেছে—মা-বাবা দু'জনই ধর্মের জীবনে।

আগে এরকম পোশাক পরতে ?

তখনো তো আমরা ধর্মের জীবনে আসি নি। খুব সাধারণ ছিলাম তখন।

আজ যে পরছো ?

পরেই দেখি না একদিন। অনেকদিন পড়ে আছে জামা-কাপড়গুলো। আমার তো আর আগের সে মন নেই।

চোখ তুলে আচমকাই বলল এষা, তুমি কাঁদছিলে মা ?

কোথায়! না তো!

হ্যাঁ। তুমি আজ কেঁদেছো মা। আমায় লুকিয়ো না। সত্যি কথা বল।

ছেলেমানুষ ছেলেমানুষের মতো থাকবে। ওসব কি কথার শ্রী। নিজের মাকে ধমকাচ্ছো ?

আমাকে তো কোনোদিন ছেলেমানুষ রাখো নি মা। সব সময় সবকথাই আমাকে বলেছো।

নিচে গিয়ে যা করছিলে তাই কর। আমায় এখন একটু একা থাকতে দাও।

এষা সরু সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। এষা মনে কত পরিণত তপতীর তা অজানা নয়। এভাবে তার নিজের মেয়েকে—নিজের সখীকে কখনো ফিরিয়ে দেয় নি তপতী। দিয়ে খুব কষ্টই হচ্ছিল। কিন্তু কি করবে! আজকের কান্নার কারণ নিজের মেয়েকে বলা যায় না। কেন যে সে পুরনো শাড়িটা নামিয়ে নিয়ে চুল বাঁধতে বসেছে—তাই বা বলে কি

করে মেয়েকে।
এই শাড়িটা সুবিনয়ের খুব পছন্দ ছিল একসময়। অনেকদিনের শাড়ি। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসের বারান্দায় আলাপ হওয়ার পর যখন ওরা দু'জনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল—তখন দু'একবার উইক এণ্ডে বেরোবার সময় তপতী তখনকার ফ্যাশান মতো স্ল্যাকস্ পরে সুবিনয়ের সঙ্গে গাড়িতে বসেছে। সমুদ্রের তীরে রোদ পোহাতে গিয়ে ছোটখাটো পোশাকও পরেছে তখন। সে-সময় সুবিনয় বড় অস্থির ছিল। কী করে কখন একটু নিভৃতি পাওয়া যায়—তাই ছিল ওর ধ্যান জ্ঞান। তাতে অবশ্য তপতীরও প্রশ্রয় ছিল। ও নিজে যে কারও কাছে অতটাই আকর্ষণের জিনিস—তা জানতে পেরে সুখ পেয়েছিলো নিশ্চয়। দেশে ফিরে ওসব পোশাক পরার আর সুযোগ হয়নি। সেসময় এই শাড়িটা পরে দাঁড়ালে তপতী সুবিনয়ের চোখে ধরে যেত একদম।
আজ অনেকদিন পরে সে নিজের তৈরি একটা কঠিন পরীক্ষায় নামবে ঠিক করেছে তপতী। আসলে তা একটা সরল পরীক্ষা। অনেকদিন অভ্যেস নেই—তাই কঠিন। নয়তো সরল হওয়ারই তো কথা। আজ সে সুবিনয়কে আকর্ষণ করতে চায়। এ তার কোনো হালকা বাসনা নয়। জরুরী প্রয়োজন। ভীষণ দরকার। পারলে এখুনি। কিন্তু সব খেলারই একটা নিয়ম আছে। তাতে রয়ে বসে দান দিতে হয়। তপতী আজ শতরঞ্জিতে সেই দান ফেলবে ঠিক করেছে।
কদিনই খুব টক খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল তার। যেভাবে ঠিক বুকের মাঝ-খান থেকে বমির টান আসছে—তাতে কোনো কিছুই পেটে রাখা দায়। বিকেলের দিকে অম্বল হচ্ছিল। তারপর একদিন সেদিনটা এলো। গেল। কিন্তু কিছুই হল না। তপতী ভেবেছিল—যাক না আরও ক'টা দিন। তারপর ঠিক হবে। এরকম তো আগেও হয়েছে। পিরিয়ড এগিয়েও আসে। আবার পিছিয়েও যায়। দিন দশেক যেতে সবই বুঝতে পারলো তপতী। বুঝতে পেরে তার সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল। এ আমি কি

করলাম? সামান্য অসতর্ক সুখের জন্যে একটি আগন্তুক প্রাণ এখন আমার কাছে অবাঞ্ছিত! আমি গুরুদেবকে কী বলব? সুবিনয়কে? তুমি এইভাবে প্রতিশোধ নিলে রবি! বাঁকাদহের তাঁবুতে আমাকে অসতর্ক, অস্থির করে তোলার জন্যেই তুমি তক্কে তক্কে ছিলে। আমি কিছুই বুঝতে পারি নি রবি। বিশ্বাস কর আমি খুব সরল মেয়ে।

অনেকদিন পরে আয়নায় বসে নিজেকে মনোহারী করে তোলার চেষ্টা তপতীর কাছে একসময় কসরতের মতই বিরক্তিকর হয়ে উঠলো। কিন্তু উপায় নেই। ঠোঁট, দাঁত, গ্রীবা—সবই ঘষে মেজে প্রায় নতুন করে তোলার মতো করতে হয়েছে তপতীকে। আয়নায় ভালো করে দেখলো একবার। নাকের দু'পাশে কোনো দাগ পড়েনি। কোনো ভাঁজও পড়ে নি তপতীর। অনেকদিন পরে হাতকাটা ছোট জামা পরে একটু অস্বস্তি লাগছিল। তবু নিজেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিল তপতী। যাকে দেখলে পুরুষরা ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে দেখে—সে কি এখন তাই হতে পেরেছে?

খেতে বসে এষা একবারও মুখ তুললো না। সুবিনয় দু'একবার তপতীকে অবাক হয়ে দেখলো। খাবার টেবিলেই আরও বড় একটা আশ্চর্য তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তপতী পরিষ্কার গলায় বলল, আমরা মেয়েরা নিরামিষ খাই আসে যায় না। তুমি পুরুষ। বাইরে আদালতে খাটা-খাটুনি যায় তোমার। ক্ষয় আছে, মাথার কাজের চাপ আছে। তোমায় এটুকু প্রোটিন ভাতের পাতে খেতেই হবে সুবিনয়।

তাই বলে একবাটি মাংস তপতী? তিন বছর হল আমরা মাছ মাংস খাই না।

কী রকম রোগা হয়ে গ্যাছো তুমি সে খেয়াল আছে? নাও খেয়ে নাও। তোমার শরীরের জন্যে দরকার।

এতদিন তো দরকার হয় নি।

আহারে কোনো বর্জনের কথা তো গুরুদেব দিব্যি দিয়ে বলেন নি

সুবিনয়।

ঠিক। কিন্তু আমার তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। মাফ করো। বাটিটা তুলে নাও। তোমার ইচ্ছে হলে খেতে পার।

অনেককাল পরে বিশেষ করে সেজেছিল তপতী। তারপর ভুলে যাওয়া রান্না রেঁধেছে আজ। পরিষ্কার বলল, খাবোই তো।

খেতে বসে কিন্তু খেতে পারলো না তপতী। অনেকদিন অভ্যেস নেই। শেষে পিত্তিরক্ষার মতো ভাতে জল ঢেলে লেবু চটকে খেল।

শুতে যাবার আগে ধ্যানে বসে সুবিনয় পরিষ্কার দেখলো, তপতী আদৌ একাগ্র হতে পারছে না। একবার ধূপকাঠি জ্বালছে। একবার সিধে হয়ে বসার চেষ্টা করছে। কোন্ ক্রমাগত অস্বস্তিতে যে ভুগছে তপতী তা বাইরে থেকে বুঝে উঠতে পারলো না সুবিনয়। ধ্যানের মাঝামাঝি এক-সময় উঠে গেল তপতী।

অনেক রাতে হালকা নেটের মশারিতে জানলা টপকানো ফিকে জ্যোৎস্নার ভেতর আরেকজন মানুষকে বসে থাকতে দেখে সুবিনয় তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। ভয়ও পেয়েছিল। অবাকও হয়েছিল। পাশেই তপতীর সিঙ্গল বেড্ ফাঁকা দেখে আশ্বস্ত হল।

তুমি? বলতে বলতে সুবিনয় বেড্‌সুইচ্ টিপলো। আলো জ্বলে উঠতে বলল, এখন? এখানে?

তপতী মাথা নিচু করে কাঁদছিল। কোনো জবাব দিল না।

কী হয়েছে তোমার?

তুমি কি আমার স্বামী নও? স্ত্রী স্বামীর বিছানায় আসতে পারে না? আর বলতে পারলো না তপতী। কান্না এসে গলা বুজিয়ে দিল।

সুবিনয় দেখলো তপতী তার সন্ধ্যার শাড়ি, জামা—কোনোটাই ছাড়েনি। এই শাড়ি জামা তার খুব চেনা। মুখে বলল, আমরা তো অনেক-দিন হল আলাদা শুয়ে থাকি। বলেও সুবিনয় মনে মনে খটকায় পড়ল। কী হল তপতীর? কিছুই তো বুঝতে পারছে না।

কারও কি অসুখ করতে নেই ?

বলবে তো। আমি ঘুমের ভেতর জানবো কি করে? কী হয়েছে তোমার তপতী ? বলতে বলতে সুবিনয় তপতীর কপালে আলগোছে চুমু দিল।

তপতী ছ'হাতে সুবিনয়কে জড়িয়ে ধরে বুকের ভেতব মাথাটা ঘষে দিল, আমি তো খুকি নই। ওভাবে চুমু খাচ্ছো কেন ? মুখ তুলে ধবল তপতী।

সুবিনয় মুখ সরিয়ে নিল। কা অসুখ কবেছে তোমার ? বলবে তো ?

আমার মাথাটা টিপে দাও। বলে তপতী সুবিনয়ের বালিশে শুয়ে পড়ল।

সুবিনয় মাথা টিপতে টিপতে বলল, সত্যিই কী আমার শরীরে এখনো তোমার জন্যে কোনো আকর্ষণ আছে ? এ তো সাধারণ প্রাণের স্তরের মোহ।

কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। তপতী বলল, বাজে বোকো না এখন। আমার মাথায় ভীষণ ব্যথা করছে। একটু জড়িয়ে শোও আমাকে।

তাতে কি ব্যথা কমবে! বলে সুবিনয়ের মনে পড়ল, ওরা ছ'জন কখনো একসঙ্গে শুয়ে থাকে। আবার আলাদা আলাদা খাটেও শুয়ে থাকে। গত তিন বছরে একদিন বোধহয় তপতী এরকম করে নি। সে নিজে তপতীকে কখনো এই তিনবছরে ভীষণভাবে চেয়েছে কি না মনে পড়ছে না। এরকম চাওয়ার আর কোনো মানে নেই তার কাছে। আগেকার সুবিনয়ের চোখে তপতী এখন ভীষণ মনোহারী ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। কিন্তু এখনকার সুবিনয় অন্য মানুষ। সে শুধু অবাকই হতে লাগলো।

তপতী জামা খুলে ফেলে বলল, আমার গা পুড়ে যাচ্ছে। তুমি মুখ চেপে ধরে ছাখো—আমি কীরকম কষ্ট পাচ্ছি।

মনস্থির কর তপতী।

তুমি মাথা রাখলে আমার বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে।

সুবিনয় মাথা রাখলো। তারপর তুলে নিতে গেল। পারলো না। তপতী দু'হাতে শক্ত করে আটকে রাখলো। সুবিনয়ের চোখে, মুখে তপতীর শরীরের নরম জায়গাগুলো আটকে যেতে সুবিনয়ের দম আটকে এলো। অনেক কষ্টে মাথা ছাড়িয়ে নিয়ে সুবিনয় বলল, তুমি আজ খুব চঞ্চল হয়ে পড়েছো। এসব আর আমাদের সাজে না তপতী। অনেকদিন হল আমরা এগিয়ে গেছি।

তপতা কোনো কথাই শুনলো না। আবার সুবিনয়কে প্রবলভাবে আকর্ষণের চেষ্টা করলো। সুবিনয়েব মনে হচ্ছিল, একটা ক্লান্ত পাখি অনেক কষ্টে নখ, ডানা দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে চঞ্চুর কাছে নিতে চাইছে। পাখিটার দমে কুলোচ্ছে না। বড্ড হাঁফাচ্ছে। শক্তির বাইরে বেরিয়ে গিয়ে শক্তি পরীক্ষা দিচ্ছে।

ছাড়ো তপতী। নিজের জায়গায় যাও।

না। আজ থেকে—এখন থেকে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো।

আমরা তো একসঙ্গেই আছি তপতী।

একে একসঙ্গে বলে না সুবিনয়।

কি বলে ?

আমরা দু'জন দূরে দূরেই থাকি। তুমি আমার মন ছুঁতে পারো না। আমিও তোমার মন ছুঁতে পারি না।

আমি তো বেশ পারি। ধ্যানে বসলে মনে হয়—আমি, তুমি, এষা—একই সুরে গাঁথা আছি।

কোথায় ? তাই যদি হবে তবে তোমাকে আমার সব কিছু খোলাখুলি বলতে পারি না কেন ?

আমি তো সব বলতে পারি তোমাকে। তুমি পারো না—সেটা তোমারই দুর্বলতা।

মোটেই না সুবিনয়। তুমি কি তোমার সব কথা আমাকে বল ? বল না।

আমি জানি।

একটা উদাহরণ দাও।

সেদিন রাতে বাঁকাদহে আমি রবির সঙ্গে তাঁবুতে ফিরলাম। তুমি তো আমায় কোনো কথা বললে না।

কি বলাব আছে ? তোমরা পুবনো পরিচিত।

শুধুই কি তাই ? আর কোনো প্রশ্ন জাগে নি তোমার মনে সুবিনয় ? বলতে বলতে তপতী তার স্বামীকে দু'হাতে বুকের ওপর টানলো। আগে কত সহজেই না সুবিনয় নিজের থেকে ধরা দিত।

আজ কিন্তু সুবিনয় ধরা দিল না কিংবা তপতীর ইচ্ছেমতো তার বুকে ঝুঁকেও পড়ল না।

তোমার কি মনে হয় নি—এতকাল পরে কেন রবি তাও এমন অসময়ে ? অন্ধকার রাতে ?

তা কেন তপতী ? রবিবাবুও তো মানুষ। তাছাড়া আমরা ভালোবেসে কুকুর বেড়াল পুষে এই তৃপ্তিই বোধ করতে পাবি--গৃহপালিত বেড়াল কুকুর কখনো বিদ্রোহ কববে না। যা বলব তাই শুনবে। তুমি তো মানুষ। তোমার আলাদা ব্যক্তিত্ব জেগে উঠবেই। তাকে আমি কেনই বা বিদ্রোহ কিংবা বিপথগমন ভেবে কষ্ট পেতে যাব ?

সুবিনয়, তুমি বলছ স্বাধীনতার কথা। আমি বলতে চাইছি অন্য কথা।

কি কথা তপতী ? এত বছর পরে—কেন রবি ? কেন এত রাতে ? ইত্যাদি ! ইত্যাদি !! আমরা কি জীবনের ছোটখাটো সন্দেহের জায়গাগুলো পার হয়ে আসি নি ? আজও কি সেখানে পড়ে থাকবো ? তুমি কি চাও আমার কাছে ?

তুমি সেদিন জয়পুরের জঙ্গলে ভোরবেলাকার বনভোজনে অত হাসিখুশী, উদার হয়ে উঠেছিলে কেন? রবিকে তো তার আগের রাত্রে মোটে কয়েক মিনিটের জন্যে দেখেছিলে। তার আগে তো ওকে কখনো ছাখো

নি। অন্য কোনো লোককে নিয়ে তুমি তো এতটা বাড়াবাড়ি করো না।

তোমার চোখ এড়ায় নি তাহলে!

আমি অবাক হয়েছি সুবিনয়।

আমার পক্ষে কি রবিকে অপমান করাই স্বাভাবিক ছিল?

তা বলছি না।

প্রকারান্তরে তাই বলছ তপতী। কিন্তু বিয়ের আগে তো অনেকের সঙ্গে অনেকের ভাব-ভালোবাসা হয়েথাকে। তারপর তো জীবন পালটে যায়। তখন কি ওসব দিন পুরনো হয়ে যায় না একদিন? আমিও তার বাইরে কিছু করি নি। ভালো কথা! আজ এতদিন পরে এত রাতে এ সব কথা উঠছে কি করে? তুমিও কি সেদিনের বনভোজনে ভীষণ রকমের বড়োসড়ো হয়ে বসে ছিলে না?

আমার কি আহ্লাদে আটখানা হয়ে নেচে ওঠার কথা ছিল?

অন্তত জবুথবু হয়ে বসে থাকার কথা ছিল না। বরং আমি বলব—তোমার আমার চেয়ে রবিবাবু অনেক স্বাভাবিক ছিলেন সেদিনের বনভোজনে।

তাহলে স্বীকার করলে তো! তুমি কিছুটা অস্বাভাবিক ছিলে। এসো। আর কথা নয় সুবিনয়।

না।

১৩

রবি জ্বরে একদিন বিছানায় শুয়ে থেকে বুঝতে পেরেছে—ভগবানের কোনো অ্যাড্রেস নেই। কিছু বই, মন্দির, তীর্থস্থান, ভক্ত, গুরুদেব, অবতার, ভজন আর লীলাখেলার কাহিনীই ভগবানের স্মৃতি মানুষের মনে জীইয়ে রাখে। এর সঙ্গে থাকে কিছু অনুষ্ঠান। সমুদ্রস্নানে। গঙ্গা-

পুজো। হিমালয় বন্দনা। এবং সংবৎসরে ক্যালেণ্ডারে ক্যালেণ্ডারে ছবি ছেপে ছোট বড় মাঝারি ব্যবসায়ীরা ভগবানের স্মৃতি গেরস্থর হৃদয়ে জাগরূক রাখে। আবার ভগবানকে অজ্ঞাতকুলশীলও বলা যায় না। চতুর্দিকে তাঁর বিনে মাইনের এত পাইক বরকন্দাজ।

জ্বর রেমিশন হয়েছে আজ দু'দিন। সামনের জানলা খুলতেই সেই এক দৃশ্য। একদম ছবি আঁকা। বোগেনভেলিয়াব বুড়ো লতায় ফুলে লতায় একদম ছবি হয়ে কাকটা বসে আছে। বসে বসেই সোজা রবিকে দেখলো কাকটা। চোখেব পলক পড়ছে না। রবি নিরুপায় হয়ে তাকিয়ে রইলো।

শেষে এই ছবিটার হাত থেকে বাঁচতে ববি গুরুদেবের জীবনী বইখানা হাতে তুলে নিল। পাতা ওলটাতে ওলটাতে সেই জায়গায় এলো—যেখানে গুরুদেব বলছেন, প্রাণের স্তরে সাধনা করে তিনি তাঁব সাধন ঘরের দেওয়াল বরাবব শূন্যে ভাসছেন। ইচ্ছে হলেই গুরুদেব তখন ভাসতে পারবেন। পরে তিনি বলছেন, এ সাধনা নিম্নস্তরের। স্বয়ং ভগবান এসে তাঁকে অভয় দিচ্ছেন। ভগবান বলছেন, তোমার কোনো ভয় নেই। এগিয়ে যাও। আমি আছি।

পুরো ব্যাপারটাই বিশ্বাসের ব্যাপার। সমুদ্র সৈকতে সাধনঘরের আশ-পাশের বাড়িতে সমুদ্রের ঢেউ দাপটে এসে ঢুকছে। শুধু গুরুদেবের ঘরেই ঢেউ ঢুকছে না। সেখানটায় সি-ব্রেকার ঢোকার সাহস পাচ্ছে না। একজন ভক্ত তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখছেন, দেখিলাম গুরুদেবের মাথার পিছনে স্বয়ং ঈশ্বর যেন উজ্জ্বল আলোর চালি ধরিয়া আছেন। ইচ্ছেমতো শূন্যে ভেসে বেড়ানো থেকে—এসব পর্যন্ত সবই স্রেফ বিশ্বা-সের ব্যাপার। মানুষ বড়ই বিশ্বাস করতে ভালোবাসে।

গুরুদেব নিজের কথা নিজে লিখে গেছেন। শূন্যে ভেসে বেড়ানোর সময় তাঁর কোনো সাক্ষী ছিল না। মুগ্ধ, আচ্ছন্ন ভক্ত তাঁর মাথার চারদিকে আলোর চালি দেখে থাকতে পারেন। এই দেখাটা তার মনের ইচ্ছার

প্রতিবিম্বও হতে পারে। সি-ব্রেকার যেন তাঁর সাধনঘরে হানা দেয় নি তা এক গুরুদেবই বলতে পারেন। সবটাই এত বিশ্বাসের ব্যাপার। যে-বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে তাঁর আজ এত ভক্ত, এত প্রতিষ্ঠান, এত অনুষ্ঠান।

বুবু এসে বলল, আমাদের সঙ্গে একটু খেলবে বাবা।

টুনিও এসে ঝুলে পড়ল। হ্যাঁ। খেলতে হবে বাবা।

তোমাদের মাকে ডাকো।

এখন ডাকলে মা মারবে।

কি কবছে।

বুবু বলল, শাড়িতে ফলস্ লাগাচ্ছে।

খেলা মানে— টুনি লুকিয়ে থেকে 'টুকি' দেবে। সব জেনেও বুবু টুনিকে ছোঁবে না। তারপর টুনি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে ধরা দেবে। আসলে টুনি এখনো স্কুলে পড়ে না। একদম এলেবেলে। তাই ওকে সবজিনিসে ইচ্ছে করে জিতিয়ে দেওয়া হয়।

খানিক খেলে রবি বলল, এই আসছি। দোতলায় গিয়ে আয়নায় দাড়ি দেখে কামাতে বসলো। তারপর পাটভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। অনেকদিন বীথিদের বাড়ি যাওয়া হয় নি। রাস্তাটাই একদম ভুলে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার। আজ সমাধিভবনে গুরুদেবের ধ্যান হয়। ঠিক সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায়। কিন্তু গিয়ার টপে পড়তেই রবি স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ি নিয়ে চলল পার্ক স্ট্রীটের দিকে।

কুন্দ তার ফ্ল্যাটে ছিল। দোর খুলেই বলল, একি ? আপনি একা ? বিনুদা কোথায় ?

তা তো জানি না। আমি একা চলে এলাম।

খুব রোগা হয়ে গেছেন।

আপনাকে দেখতে এলাম। একটু বসতে দেবেন ভেতরে ?

ওভাবে বলছেন কেন ? আমার মন খারাপ হয়ে যায় রবিবাবু।

আসুন।

রবি আন্দাজ নিচ্ছিল মনে মনে। কুন্দ সম্ভবত তার বয়সী হবে। যত্ন তোয়াজের শরীর বলে এমনি এই বয়সের মেয়েদের চেয়ে কুন্দর গাঁথুনি অনেক ভালো।

রবি বসতেই কুন্দ বলল, কী হয়েছিল ? এতদিন আসেন নি কেন ?

জ্বর।

ওমা ! কিছুই জানি না তো।

আজ আমার আসার কথা বিনয়বাবু জানেন না কিন্তু।

তাতে কি ! আপনি তো মস্ত লোক। গুণী লোক। বিনুদা বলছিল সেদিন। তবে শুধু বসবেন কিন্তু। আর কিছু নয়।

একটু গান শুনবো কুন্দ।

গলা যে ভালো নেই রবিবাবু।

আমার মনও ভালো নেই।

আমি কি শান্তি দিতে পারবো রবিবাবু। একটু তিলোক কামোদ গাইছি। কথা মনে নেই। সুরটা শুধু।

তারপর গাইতে গাইতে কুন্দ এক কাণ্ড করলো। নানা সুরের গান কথা বাদ দিয়ে গুনগুন করে গলায় তুলে যেতে থাকলো। রবি একসময় উঠে গিয়ে সামনের বড় পর্দাটা সরিয়ে দিতেই হুড়মুড় করে বিকেলবেলার আলো এসে আছড়ে পড়ল। তখনই কুন্দব গলায় সুরের সঙ্গে সঙ্গে কথা বসে যেতে লাগলো। একসময় আচমকাই গান থামিয়ে কুন্দ হুহু করে কেঁদে ফেলল।

কি হল ? আমি কি কিছু ভুল করলাম ?

শশব্যস্ত রবিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে কুন্দ বলল, আপনি বসুন। আপনি কিছু করেন নি।

রবি বসে পড়েও ভাবলো, যাই বাড়ি যাই। কিন্তু উঠতে পারলো না।

কুন্দ বলছিল, দশ বছর আগে যে-ছেলের বয়স ছিল চার—এখন তার

কত হতে পারে বলুন তো?

এত সোজা হিসেব কেন জানতে চাইছে কুন্দ তা বুঝে উঠতে পারলো না রবি। মুখে বলল, চোদ্দ।

একজন চোদ্দ বছরের ছেলে এই অজানা পৃথিবীতে কোথায় কী করছে কে জানে! বলতে বলতে কুন্দর চোখে আবার জল এসে গেল।

কে কুন্দ? কার কথা বলছেন?

আমার ছেলে। খোকোন। মহাষ্টমীর রাতে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে হাত ছাড়িয়ে হারিয়ে গিয়েছিল ভিড়ে।

পুলিশে খবর দিয়েছিলেন?

আমিও যে হারিয়ে গেলাম রবিবাবু!

আপনার স্বামী? তিনি?

ওই যে বললাম—আমিও হারিয়ে গেলাম! আমাদের তিনজনের মধ্যে আর দেখা হয় নি।

বিনয়বাবু তো করিতকর্মা লোক। তিনি চেষ্টা করলে—

চেষ্টা করলে সব ঠিক হয়ে যায়! সব আবার আগের মতো হয়ে যায়! খোকোনের ছবি দেখুন—ওই যে—রবিকে বলার দরকার ছিল না। কুন্দর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই রবি আগেরদিন বেরোবার মুখে দেখা দেওয়ালের সেই ছবিখানা নিজে থেকেই দেখছিল। আর বারে বারে নিজের মনের মধ্যেই আছাড় খাচ্ছিল। এইসব মেয়েছেলের যা হয়ে থাকে—অতীতে একজন স্বামী থাকে। একটি বাচ্চা থাকে। এ-কিছু নতুন নয়। কিন্তু তার সঙ্গে মহাষ্টমীর রাতে হাত খসে চার বছরের ছেলের ওই হারিয়ে যাওয়ার গল্পটাই বড় মন খারাপ করে দেয়। চেষ্টা করলে! বিনয়বাবু চেষ্টা করেই কুন্দকে এখানে এনে তুলেছে! সে চেষ্টা করলে করবার মতো বাকী থাকে আর কি! রবি চোখ বুজে একটি হারিয়ে যাওয়া চার বছরের ছেলেকে ভিড়ের ভেতর কাঁদতে কাঁদতে হেঁটে যেতে দেখলো।

কুন্দর কথায় চোখ খুলতে হল রবির।
আপনাকে কি দেব?
আমি? জ্বর থেকে উঠেছি সবে। কি খাবো বুঝতে পারছিনে।
আমার এখানে তো মন খারাপ করতে আসেন নি। ঠাণ্ডা বিয়ার দি।
গ্লাস নিয়ে ফিরে আসার আগে কুন্দ স্টিরিওতে আলি আকবরকে চাপিয়ে দিয়ে এসে বসলো। নিজে নিল হোয়াইট রাম।
এই গরমের বিকেলে রাম? হার্ড জিনিস এখন খাবেন?
না হলে রবিবাবু আবার চোখ দিয়ে জল বেরোতে পারে। আপনার তখন খুব খারাপ লাগবে।
বিনয়বাবু এসে পড়লে কি হবে!
কিছুই না। খুশীই হবেন বিনুদা।
খুশী?
হ্যাঁ। আপনার জন্যে তার ঢালাওভাবে বলা আছে।
বড় ভালো মানুষ।
হুঁ। খুব ভালো!
ও কি কুন্দ? আপনি রামের সঙ্গে আবার বিয়ার মেশালেন কেন? ক্রস হয়ে গিয়ে—
ভালোই তো রবি। কুইকলি একটা কিক্ পাবো।
লং প্লেয়িং স্টিরিও রেকর্ডে আলি আকবরের স্ট্রোক সোজা রবির বুকে গিয়ে বিঁধলো।
খানিক বাদে কুন্দ নিজেই উঠে দাঁড়াল। রেকর্ডটা পালটে দি।
পালটে দিয়ে কুন্দ কার্পেটের ওপর পা ফেলে ফেলে নিঃশব্দে তাল মেলাতে লাগলো।
ঘিয়ে রঙের তাঁতের শাড়ি প্রায় হাঁটু অব্দি উঠে এসেছে। মুখখানা লাল। স্টিরিওতে তবলা আর তারের বাজনা দু'ভাগ হয়ে আলাদা করে বাজছে। বিকেলটাকে খেয়ে ফেলে সন্ধ্যে একদম ঝুলবারান্দায় উঠে

এলো। দূরে ময়দানে আলো। বিরাট সাইজের রাজহংসী হয়ে কুন্দ দুলতে দুলতে তাল রাখছিল। ডান হাতে গ্লাস। বাঁ হাতের আঙুলে তুড়ির মুদ্রা। রবির বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করছিল। বসবে কি উঠে দাঁড়াবে ঠিক করতে পারছিল না। সুন্দর ভঙ্গিতে কুন্দ এখন দুলছে। একে নাচ না বলে ঝড়ের সঙ্গে কোনো তরুণ তরুর দুলুনী বলাই ভালো। কেন যে ভরা বিকেলে ক্রস করে খেতে গেল।

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েই রবি সামনের দিকে ছুটে গেল। না ধরলে কুন্দ নাক বরাবর সোজা গিয়ে কার্পেটে মুখ থুবড়ে পড়তো। ফাঁকা ফ্ল্যাটে সরোদের স্ট্রোক বাতাসের মাংস খুবলে তুলে নিচ্ছিল। রবির পাঞ্জাবির হাতায় কুন্দ হড় হড় করে বমি করে ফেলল। সরি। আপ-নাকে আনন্দ দিতে গিয়েই গোলমাল করে ফেলেছি।

কোনো কথা না বলে রবি পা পা হাঁটি হাঁটি করে কুন্দকে পাশের ঘরের বিছানায় নিয়ে এলো। শুইয়ে দিল। পাশেই খোলা বাথরুমের কল ছেড়ে দিয়ে পাঞ্জাবির হাতাটা ধুতে গিয়ে কেলেঙ্কারি। সারা জামা ভিজে একশা। শীত করে উঠলো একবার। অগত্যা জামাটা খুলে ঘরের ভেতর হোয়াইট নটের ওপর মেলে দিল। তখন নজর পড়ল কুন্দর ওপর। এক একটা খিচুঁনিতে কাত হয়ে কুঁচকে যাচ্ছে কুন্দ। ওর মুখটা মুছে দেওয়া দরকার।

তোয়ালে ভিজিয়ে এনে মুখ মুছে দিতে গিয়ে আরেক মুশকিল। দু'-হাতে কুন্দ ওর গলা জাপটে ধরল। বহু কষ্টে ছাড়াতে হল নিজেকে। তখন কুন্দ জড়িয়ে জড়িয়ে বলছে, জামাইবাবুকে কিছু বোলো না কিন্তু প্রশান্ত। জানলে আমায় পেটাবে।

প্রশান্ত ? প্রশান্ত কে ?

আমি খারাপ নেচেছি প্রশান্ত ? কী গরম কী শীত—জামা গায়ে আমি নাচতেই পারিনে। খারাপ নেচেছি প্রশান্ত? জামাইবাবুকে বোলো না কিন্তু—

কে জামাইবাবু? কার কথা বলছেন কুন্দ? প্রায় ঝাঁকুনি দিয়েই জানতে চাইলো রবি। তখন কুন্দ কয়েক ঘণ্টার জন্যে ঘুমের পূর্ণগ্রাসে চলে গেল। রবি বেরিয়ে এসে সবার আগে সদর দরজা বন্ধ করলো ভালো করে। তারপর ক্ষ্যাপা স্টিরিওটাকে থামালো। পাখা চালিয়ে ভিজে পাঞ্জাবি কার্পেটের ওপর ভালো করে মেলে দিল। ঘুমন্ত কুন্দ অন্য জিনিস। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রবি বুঝলো, এখন আর কাউকে খুশী করার দায়দায়িত্ব নেই। নিশ্চিন্ত বিশাল দুই চোখের ঝাঁপ ফেলে দিয়ে কুন্দর সারা শরীরে এখন হরতাল। ডান পা-খানা অনেকটা শাড়ির বাইরে বেরিয়ে। রবি পাড়সুদ্ধ টেনে দিল। আজও ব্রেসিয়ারের ওপর ব্লাউজ পরে নি। গরমে কে আর ফাঁকা ফ্ল্যাটে জামা পরে ঘোরে। এই অবস্থায় মেয়েদের পূজারিণী পূজারিণী লাগে রবির। সে সারাটা ফ্ল্যাট ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো।

অন্তত দু'হাজার স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট। আধুনিক সব কিছু দিয়ে সাজানো। বয়স হলেও পয়সার চাপে রুচি হারায় নি বিনয় বোস। দামী কাঠের সেণ্টাব টপ টেবিল। দেওয়াল জুড়ে ভোট রমণী আঁকা প্রমাণ সাইজের স্ক্রল ঝুলছে। বিনুদা তো বোঝা গেল। কিন্তু জামাই-বাবু আবার কে? প্রশান্তই বা কে? বোঝাই যাচ্ছে জামাইবাবুকে কুন্দ খুব ভয় করে। হোয়াটনটের নিচের ড্রয়ার থেকে অনেকগুলো ম্যাগাজিন উথলে বেরিয়ে ছিল। একটা টানতেই 'প্লেবয়' বেরিয়ে এলো। স্পেশাল নাম্বার। স্পেশাল ছবি। শুধু সঙ্গমের। সাহেব মেমদের। নানা রকমের। একজায়গায় লেখা—ডু ইট নাউ।

রবি ম্যাগাজিনখানা জায়গামতো রেখে কুন্দর পালঙ্কের কাছে দাঁড়ালো। বোধহয় ভারই বয়সী হবে কুন্দ। সামনের বিরাট লিভিংরুমের দেও-য়ালে ওর ছেলের চার বছর বয়সের ছবি। এই নির্জন ফ্ল্যাটে কুন্দ দীর্ঘ-কাল ওস্তাদের কাছে নাচগানের তালিম নিয়েছে। তাই আর স্বামীর সঙ্গে দেখা হয় নি। বিনুদা চেষ্টা করলেই হয়ে যেত। মনে মনে রবি

নিজেকেই বলল, আমাদের বিনু এক গাট্টাগোট্টা শালা! এবার রবি পালঙ্কের ওপর ওঠে বসলো।

ঠিক এই সময় বীথির সঙ্গে সঙ্গে তপতী বেরিয়ে এলো। বীথির চেম্বার থেকে। বাড়িতেই বীথি আর সনতের আলাদা আলাদা চেম্বার। তবে অপারেশন থিয়েটার কমন। সনৎ এখন সেখানে। বাইরে লাল আলো জ্বলছে।
বীথি বলল, না দিদি—তোর পালস বিট্ ভালো নয়। এষার পর তো এতকাল কোনো বাচ্চা হয় নি। থাক না বেবিটা। এ-বয়সে আর অপা-রেশন ভালো নয়।
তোদের তো পাকা হাত। না হয় দিদিকে খালাস করে দিলিই।
কথাটা কোথায় খচ্ করে বিঁধলো বাথিকে। তুমিও তো আর কাঁচা মানুষটি নেই দিদি।
আমি তোদের ব্যথা দিতে বলি নি কথাটা। তোরা তো অনেকেরই অ্যাবরশন করাস। সেই চেম্বারে বসে ইস্তক। কতজনে করিয়ে গেল। দিদিরটা না হয় ভালো করে দিলি।
সুবিনয়দার মত আছে?
তাঁকে জানাতে চাই না।
বাঃ! তাঁর সন্তান। সে জানবে না?
তপতী বুঝলো, নিজের ছোট বোন হলেও খুব সাবধানে কথা বলতে হবে। সে অন্য কোনো নারসিং হোমে যেতে পারতো। ক'দিন সেখানে থেকে একদম ঝাড়া হাত-পা হয়ে ফিরতে পারতো। কিন্তু তখনই সুবি-নয় প্রশ্ন তুলবে। নারসিং হোম কেন? এত দিন কেন? অসুখটা কি? তার চেয়ে বোনের বাড়ি বেড়াতে এসেছি। সে যে অনেক ভালো। কাজও হল। বিশ্রামও হল। সুস্থ হয়ে তবে বাড়ি। মুখে বীথিকে শুধু বলল, এখন তো আর্লি স্টেজ। এত জানাজানির কি দরকার বল।

বেশ। একটা ইঞ্জেকশন দিযে দিচ্ছি আমি। তাতে হয়ে গেল তো ভালো। নয়তো সুবিনয়দাকে তো বলতেই হবে।

তুই ইঞ্জেকশন দে তো আগে। পবে দেখা যাবে।

মেজানিন ফ্লোবেব চেম্বাব থেকে দু'বোন নিচে নেমে এসে দেখলো ফাঁকা বসবাব ঘবে ছোটমেসো এসে বসে আছেন। ওদেব চেয়ে কিছু বড বলে ওবা নাম ধবে তুমি তুমি বলেই ডাকে।

কখন এলে মেসো?

এইতো বসে আছি তোদের জন্যে।

সবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

বিনুদা? সেই শিবসাধক তো বাড়িই যাবে না। দেখা পাবো কোত্থেকে! এদিকেও অনেকদিন আসি নি। তোবা কেমন আছিস? জামাইরা?

তপতী বলল, সবাই ভালো। এবাব তুমি একটা বিয়ে কবো মেসো। অনেকদিন তো ওয়েট কবলে।

তোবা না ব্রহ্মচাবী! শেষকালে নিজের মেসোকে এই কুপ্রস্তাব দিচ্ছিস!

ব্রহ্মচাবী কথাটা গিয়ে তপতীব একদম হাড়ে লাগলো। আস্তে বলল, পেট্রলপাম্প নিয়ে সাবাদিন কাটালে জীবনটা কাটবে?

খাবাপ কি! কত জায়গার গাড়ি আসে। তেল ভরে নিয়ে চলে যায়।

বীথি বলল, কোথাও কোনো খোঁজ পেলে?

গতমাসে বিনুদা বলেছিলেন, ময়ূবভঞ্জ থেকে একটা খবব আছে।

গেলে সেখানে?

ছুটলাম। কত দেশ তো এভাবে দেখা হয়ে গেল।

এলোপাথাড়ি ঘুবে কোনো লাভ নেই মেসো। এখন তোমার বয়স কত হল?

তা বেয়াল্লিশ! চেয়ারে বসে পেট্রল বিক্রি করি। আমার ঘরেব পেছনেই ধানক্ষেত। গরু দাঁড়িয়ে থাকে বাঁধে।

তপতী খুব আগ্রহ করে বলল, তোমার তাহলে হয়ে এসেছে ! এবার দীক্ষা নাও। সব ভালো লাগবে। আমাদের বড় আশ্রমে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

তা কেন তপতী ? আমি তো বেশ ভালো আছি। যা খাই হজম হয়। ন্যাশন্যাল হাইওয়ে সিক্সের ওপর পেট্রল পাম্প। দিনরাত কেনাবেচা। সূর্য, চাঁদ, তারা সবই চেয়ারে বসে দেখতে পাই। সবই আমার পাম্প থেকে দেখা যায়। দেখতেও ভালো লাগে। এক একটা ষাঁড় এত সুন্দর রাস্তা ক্রশ করে। এত গ্রেসফুলি।

ওরা বেঁচে থাকলে এতদিনে একটা খবর পেতে মেসো।

আমি তো বুঝি—ওরা বেঁচে আছে।

তাই থাক। তাই ভালো। আমাব সঙ্গে যাবে নাকি। তোমার সঙ্গে জামাইয়ের দেখা হত।

নারে তপু। এ-বেলাটা এখানে কাটিয়ে—বিনুদার সঙ্গে দেখা করে তবে ফিরবো।

বীথি বলল, মায়ের সঙ্গে দেখা করবে না ?

না। দিদি আমায় দেখলেই কাঁদে। সে দৃশ্য আমার সয় না। আমি বেশ আছি। খুব ভালো আছি। লরি, বাস, টেম্পো, প্রাইভেটে তেল ভরি। এক এক গাড়ি এক এক দিকে চলে যায়। কেউ ফিরে আসে। কেউ আসে না।

তপতী কোনো কথা না বলে তাকিয়ে ছিল। তখন তার মনে পড়ল, একদিন খুব সকালে তার নিজের বাবাকে একজনের ঘর থেকে বেরোতে দেখেছিল। মা তখন পুজোর ফুল তুলতে গেছে। একছুটে ছোটমাসী বাথরুমে চলে গিয়েছিল। তপতী তো ভুল দেখে নি।

ছোটমাসীর ওরা নাম ধরেই ডাকতো। আবার মাসীও ডাকতো কখনো কখনো। শিপ্রা নামটা আজকাল আর এবাড়িতে বড় একটা ওঠে না। অনেকদিন পরে মেসো নিজেই বলল। হাসতে হাসতেই বলল, যদি

কোনোদিন কোনো গাড়িতে করে শিপ্রা তেল ভরতে আমার পাম্পেই আসে। অন্য কোথাও কারো সঙ্গে বিয়েতে বসতেও তো পারে।

আমাদের মাসীর নামে বাজে কথা বোলো না। বীথি একথা বলেও থামলো না। নিশ্চয়ই মারা গেছে। নাহলে এতদিনে একটা খবর আসতোই। ময়ূরভঞ্জে কী দেখলে?

বিন্নুদা তো চেষ্টার ত্রুটি করছে না কোনো। তোরা তো জানিস—শিপ্রা বলতে তিনি অজ্ঞান। এক এক জায়গায় যান—আর আমায় চিঠি লেখেন—সেই মুখখানি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছি। অমন মুখ তো একখানাও এখানে দেখি না।

১৪

নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরির শেষদিকে—কিংবা টোয়েন্থিয়েথ্ সেঞ্চুরির গোড়ার দিকে এমন চেহারার মানুষকে স্বদেশপ্রেমিক, পরিশ্রমী, পণ্ডিত বলে অনেকে এঁকে গিয়েছেন। ছবিতে। লেখায়। এখন বিশ শতকও বুড়ো হতে চলল। এইসময় অমন শক্ত বাঁধুনির চেহারায় কাঁচা-পাকা গোঁফ দাড়ি নিয়ে বিনয় অনেকেরই দৃষ্টি কেড়ে নেয়। কিন্তু সে যে ঠিক কি করে—তা চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। রবি জানে বলে তাই। নয়তো সে-ও কি বিনয় বসুকে দেখে প্রথমেই ধরতে পেরেছিল—লোকটা ঝানু ঠিকেদার। ফসকানো ঠিকে দিব্যি হাতের ভেতর ফিরিয়ে আনে। এখন রবিদের কোম্পানির হয়ে অনেক জায়গাতেই ডিপ টিউবওয়েল বসাচ্ছে বিনয়।

সুজাতা রবিকে বলেছে—ওই যে তোমার দেড়েল লোকটা মাঝে মধ্যে এসেই তিন চার হাজার টাকা দিয়ে যায়—ও টাকা আর তুমি নিও না। ঘুষ জিনিসটা কিন্তু ভালো নয়।

রবি বলেছে, ঘুষ ভাবছো কেন? বিনয়বাবু তো ভালোবেসেই দিয়ে যান।

ঠিকেদার কখনো এমনি এমনি টাকা দেয়? ওর টাকা আর তুমি নিও না। লোকটার তাকাবার ভেতর ময়লা আছে। যতবারই আমাদের বৈঠকখানায় এসে বসেছে—ততবারই আমার কেমন যেন একটা অস্বস্তি লেগেছে।

সাইকেল রিকশা থেকে বিনয়ের সঙ্গে রবি নামলো। কালো রঙের ন্যাশনাল হাইওয়ে। রেল স্টেশন থেকে এ-পথটুকু দু'জনের আধঘণ্টা লাগলো। বিনয় আগে আগে হাঁটছিল। পেছনে রবি। ভোর ভোর মেল ট্রেনে উঠে দু'জনে ঘণ্টা তিনেকের ভেতর কলকাতা থেকে অন্তত দেড়-শো মাইল দূরে চলে এসেছে। বাতাসে সবে শীতের ছাপ। দু'ধারের শালজঙ্গল ভেতরদিকে ক্রমেই গভীর।

আর কদ্দুর?

আর খানিকটা রবিবাবু। অল্প খরচে এমন ভালো বোর্ডিং স্কুল আপনি আর দেখেন নি।

বেলা দশটা হবে। জঙ্গলের ওপাশ থেকে একটা-কালো রঙের পাহাড় উঁকি দিচ্ছিল। হাইওয়ে থেকে ওরা দু'জনে বাঁ হাতে একটা সরু পিচ রাস্তা ধরলো।

ঠাণ্ডা বাতাস মাখানো এমন মজার রোদ্দুরে দু'জনে উঁচু নিচু রাস্তা ধরে স্কুল কম্পাউণ্ডে এসে হাজির হল। প্রিন্সিপালের পাশের ঘরে এসে দু'জনে বসলো। বিনয় বলল, রবিবাবু। এখানে এই এগ্রিকালচার স্কুলে আপনারা ডিপ টিউবওয়েল বসানোর ভার পেয়েছেন রাইটার্স থেকে। আমার সঙ্গে এসে আপনার সাইট দেখা হয়ে গেল। এবার আপনার ঠিক করতে হবে—কাকে কাজটা দেবেন।

কিন্তু সেজন্যে তো আমরা এখানে আসি নি বিনয়বাবু। আপনি বলে-ছিলেন—কাকে এখানে খরচা দিয়ে স্কুলে পড়াচ্ছেন—তার সঙ্গে দেখা

করবেন। প্রিন্সিপালকে বললেন তো— ছেলেটিকে ডেকে দিতে।

নির্জন ভিজিটারস্ রুম। জানলায় পাহাড়ের মাথা। শালজঙ্গল। সাঁই সাঁই বাতাসের শব্দ। দূরে ক্লাসঘরে ছেলেদের মাথার কালো কালো আবছাভাব। কৃষি স্কুলের মাঠে গমের চারা সবে ঠেলে উঠছে। একদল ছেলে তাদের স্যারের সঙ্গে জমির আল ধরে দূরে হেঁটে চলেছে।

বিনয় বলল, দু'টো কাজ একসঙ্গে সারবো রবি ভাই।

এই এক নতুন উপসর্গ হয়েছে বিনয়ের। মাঝে মাঝে তাকে ভাই বলে ডাকে। ড্রিংকস্ বেশী হয়ে গেলেও কুন্দর ঘরের কার্পেটে বসে বিনয় কয়েকবার তাকে ওই ডাকে ডেকেছে। আজ কিন্তু দু'জনের কারও কোনো নেশা হয় নি। অর্ধেক বন্ধুত্ব, অর্ধেক স্বার্থ মিশিয়ে বিনয়ের সঙ্গে রবির —রবির সঙ্গে বিনয়ের এই মেশামিশি। কখনো টাকা, কখনো ড্রিংকস্, কখনো টিউবওয়েলের ঠিকে, আবার কখনো নির্জন ক্লোবে, সামান্য বেশ-বাশে, নেশায় আলু-থালু কুন্দর নাচ—এসব নিয়েই রবির সঙ্গে বিনয়ের দেখাসাক্ষাৎ।

তার ভেতর নতুন ঘটনা—বিনয়ের খরচায় পড়ানো একটি অনাথ বালকের সঙ্গে দেখা করতে কলকাতা থেকে এই দেড়শো মাইল ছুটে আসা।

বছর তেরো চোদ্দর একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকলো। কপালে ঘাম। কখন এসেছেন?

এই তো। বলে বিনয় তার ডানগাল এগিয়ে দিতে ছেলেটি শব্দ করে চুমু দিল। আমার জন্যে কাঞ্চননগরের চাকু এনেছেন? এ টি দেবের ডিকসোনারি?

সব। বলে রবির চেয়ারের পাশে টুলটা দেখালো। সেখানে ওসব প্যাকেট করে গোছানো। তের চোদ্দ বছরের ঝকঝকে ছেলেটি রবিকে দেখতে পেল। দেখে একটু কুঁকড়ে গেল।

বিনয় রবিকে দেখিয়ে বলল, আমার বন্ধু। প্রণাম কর।

ছেলেটি প্রণাম করতে এগিয়ে আসতে রবি তাকে দু'হাতে ধরে ফেলল।

ধরে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। মুখখানা পাশের শালজঙ্গলের মতোই সতেজ। বাতাসে বুনো গাছপালার কটু গন্ধ। বিনয়ের কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি অন্ধকারে সামান্য আলো পেয়ে জ্বলজ্বল করে উঠলো। রবির ফস করে মনে হল, এ ছেলেটিকে আমি কোথায় দেখেছি? কোথায়? আঃ! কিছুতেই মনে পড়ছে না।

রবির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছেলেটি বিনয়ের দিকে ঘুরে বলল, আপনি নিজে অ্যাতোটা এলেন কেন? পার্সেলেই পাঠাতে পারতেন। নিজের বাবাকে অনেকে আপনি বলে। আবার জ্যাঠা, খুড়ো, মেসোকেও লোকে আপনি বলে। তাহলে এ-ছেলেটি কে বিনয়ের? অবৈধ সন্তান? পালিত পুত্র? অনাথপালন? কোনোটাই রবি বুঝে উঠতে পারলো না। অথচ ছেলেটিকে ভীষণ চেনা লাগছে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে আবার সাইকেল রিকশা। বিনয় বলল, আমার এক চেনাজানা বন্ধুর ছেলে। অভাবী। ওরা মানুষ করতে পারলো না বলে আমি ভার নিলাম।

ছেলেটি তা জানে?

না। ও জানে—ও অনাথ। পিতৃমাতৃহীন। আমি ওর জ্যাঠামশাই। ভীষণ ভালোবাসে আমাকে। আমারও মায়া পড়ে গেছে।

কি নাম ছিল ওর বাবার?

বিনয় কোনো জবাব দিল না। বরং অন্য জায়গা থেকে শুরু করলো। রবিকে বলল, জানেন—এখানে আমার এক পুরনো বন্ধু মহুয়ার ডিস্টিলারি করেছে। চলুন ঘুরে আসি। লোকাল মেয়েছেলের সস্তা লেবার। বেশ ভালোই ব্যবসা করছে। যাবেন?

বলেই কিন্তু বিনয় আর রবির মতামতের জন্যে অপেক্ষা করল না। খানিক এগিয়ে রিকশাওয়ালাকে ডান হাতে একটা সরু বনপথে ঢুকে পড়ার ডিরেকশন দিল।

দু'ধারের শালগাছ কেটে রাস্তা বানানো। পাথরের ওপর সারি সারি

ইট সাজিয়ে পথ। সাইকেল রিকশা, গাড়ির টায়ারেব ছাপ ঘাসেঢাকা নরম মাটিতে। রবি এই সময় প্রায় আপনাআপনি বলে উঠলো ও বুঝেছি।

কি বুঝেছেন ?

বিনয়েব এ কথায় ববি সতর্ক হয়ে গেল। মুখে বলল, নাঃ। কিছু না। মনে মনে নিজেকে বলল,ছেলেটি.কুন্দব। সেই মহাষ্টমীর বাতে হাবানো ছেলে। নিশ্চয় সেই ছেলে।

নিজের মনকেই ববি বলল, বিনয় তো সা‌ংঘাতিক লোক। লোক লাগিয়ে মহাষ্টমীর রাতে কুন্দর ছেলে, স্বামীকে ভিড়ের ভেতর হাবিয়ে দিল। তাহলে স্বামী বেচাবা কোথায় ? বেঁচে আছে তো ? এ নিশ্চয় কুন্দর ছেলে।

এমন লোকের সঙ্গে একই রিকশায় পাশাপাশি। নির্জন বনপথে। রবি আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকলো। আর কতদূর ?

এই তো এসে গেলাম রবিবাবু।

শিবমন্দিরের সব ক'টা ধাপ জয়পুরী মার্বেলে গাঁথা। বেহালার এদিকটায় ক'বছর আগেও ধানক্ষেত, দীঘি, নারকেল বাগানের ছড়াছড়ি ছিল। এখন নতুন নতুন বাড়ি, নিওনের লাইটপোস্ট বসানো চওড়া রাস্তা— বেহালাকে আর চেনা যায় না।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে বিনয় রবিকে বলল, আমি শিবসাধক। চৈত্রে এখানে গাজন হয়। আসবেন আপনি। এই পাশের বাড়িটা আমি খুব সস্তায় কিনেছিলাম। তারপর ভেঙে পালটে দিয়েছি। দোতলার সব ক'টা ঘর নিয়ে আমার মিসেস থাকেন।

রবির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, এলাহী কাণ্ড।

নাঃ! তেমন কিছু না। দু' মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। এক ছেলে। সে ব্যবসা করে আলাদা।

একজনের কত লাগে বিনয়বাবু ?
খুব সামান্য। আমার মৃত্যুর পর এসব তো কোনো কাজে লাগবে না। পাবলিক চ্যারিটির জন্যে দিয়ে যাবো।
মন্দিরের সামনে বিরাট দীঘি। তাতে সুন্দর বাঁধানো ঘাট। কলকাতার ভেতর এমন ছবির মতো জায়গা বড় একটা চোখে পড়ে না। শীত আসবে বলে রোদ্দুরে মিঠে ঠাণ্ডার মিশেল। বিনয়ের হাঁটাচলা, দাঁড়ানো— মন্দিরের একদম সেবায়েতের মতোই। সে কিছুই জানে না। এত খরচ —এত ঘর দালান—সবই বাবার ইচ্ছেয় হয়েছে। বাবা করে দিয়েছেন। দুই ভ্রূর মাঝখানটায় তেল-সিঁদুরের একটা বড় ফোঁটা দিলেই এই বিনয় একেবারে তন্ত্র-সাধকের চেহারা পেয়ে যায়। বিনয় এখন রবির কাছে একটা নেশা। কাল রাতেও দু'জনে বসে কুন্দর গান শুনেছে। রবিকে দেখিয়ে বিনয় কুন্দকে অন্তত তিনবার বলেছে—রবিবাবু আমাদের মস্ত লোক। মহাভাগ্য যে তিনি এখানে গান শুনতে এসেছেন তোমার। আরেকটু মন ঢেলে গাও কুন্দ।
রবি এখন ঠিক করে বলতে পারবে না—বিনয়ের এই আদর আপ্যায়ন ঠিকেদারি যত্নআত্তি—না, জেনুইন। বিনয় এখন রবিদের কোম্পানির হয়ে সাত জায়গায় টিউবওয়েল বসাচ্ছে। রবির ছেলে বুবুর স্কুল পালটানো হবে কি না—তাও ঠিক হয় বিনয়ের কথায়। অবশ্য এত করেও বিনয় তার ওপর সুজাতার বিরক্তি এতটুকু কমাতে পারে নি।
মন্দিরের গায়ে ভোল পালটানো বাড়ির বারান্দায় বসে রবি চা খাচ্ছিল। পাশে বিনয়। দূরে দীঘির পাড়ে একটা অ্যামবাসাডার থামলো। দরজা খুলে যে বেরিয়ে এলো—তাকে দেখিয়ে বিনয় বলল, আমার বড় মেয়ে। আজ তপতীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।
নামটা শুনে রবি চমকে তাকালো। মহিলা তখন দীঘির পাড় ধরে এগিয়ে আসছিলেন। হ্যাঁ। তপতী।
তাহলে তো এ বাড়িতে আমি এসেছি। নিশ্চয় এসেছি। এই তো সেই

দীঘিটা। একটা সজনে গাছ ছিল। ওই তো সেই গাছ। আগের চেয়ে অনেক বুড়ো হয়ে গেছে। রবি তার সোফায় নড়ে চড়ে বসলো। মান্দিরটা নতুন। তখন হয় নি। তখন তপতীর বাবা ঢাকায় ওষুধ নিয়ে যেতেন পেটি পেটি। এই বিনয় বসু তাহলে তপতীর বাবা। যার ইচ্ছেয় তপতীকে অকারণে পড়াশুনোর জন্যে বিদেশে যেতে হয়েছিল। যার জন্যে তপতী আজ আমার বউ নয়। যা কিনা তপতী সহজেই হতে পারতো। যার ভালোবাসা তপতী আর বীথির পক্ষে লোহার তৈরি আদেশ হয়ে দেখা দিত।

তপতী তখনো রবিকে দেখতে পায় নি। পেলো। বাবান্দায় উঠে। তখন তপতীর মুখে সামান্যও কোনো পরিবর্তন এলো না। বিনয় উঠে দাঁড়িয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তপতীকে রবির কথা বলল—মস্ত লোক। এত বড়মানুষ যে আমাদের বাড়ি এসেছেন সেটা ভাগ্য।

তপতী কোনো কথা না বলে ভেতরে গেল। যাবার সময় বলল, চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রবি মনে মনে বলল, ভাগ্যিস এষা আসে নি। তাহলে না-জানি কি কেলেঙ্কারীটাই হোত। এই তো মাস দুই আগে বাঁকাদহে চাপা খালেব তীরে। দুপুরে টলটলে জলে স্নান। এষা ছুটে গিয়ে প্রজাপতি ধরলো। তাঁবুতে তপতী ঘুমোচ্ছিল। আমি পাকাপাকি একটা চিহ্ন রেখে এলাম। তপতীর চেহারা কি এখন কিছু ভারী হয়েছে?

বাবা আলাপ করিয়ে দিলেও তপতী যে রবিকে তেমন করে পাত্তা দেয় নি—এ জিনিসটা বিনয়ের চোখ এড়ানোর নয়। রবিও যে তপতী ভেতরে চলে যেতে প্রায় নির্বাক্—সেটাও চোখে পড়ল বিনয়ের। সে বলল, এ মেয়েকে আমি বিদেশে পাঠিয়েছিলাম। বড্ড ভক্তিমতী। দেশে ফিরে গুরুদেবের সাধনায় দীক্ষা নিয়েছে।

সব জেনেও রবিকে চুপ করে থাকতে হচ্ছিল। একটা ব্যাপারে তার খুব মজা লাগছিল। এই প্রথম সে দেখলো, বিনয় তার চেয়ে পিছিয়ে।

বিনয় জানেই না—তার অজ্ঞাতে এইমাত্র তারই বাড়ির বারান্দায় একটা বড় নাটক হয়ে গেল। যে-নাটকে কোনো ডায়ালগ নেই। যেখানে চোখ পর্যন্ত স্থির থাকে। শুধু বুকের ভেতরে কিছু দাপাদাপি হয় মাত্র।

বিনয় আর বসে থাকতে পারল না। উঠে ভেতরে যাবার সময় বলে গেল, তপতীকে ডাকি। দোতলায় ওর মায়ের কাছে গেছে—

রবি প্রায় বিড়বিড় করে বলল, কোনো দরকার নেই। থাক না।

বিনয় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, এক পেয়ালা করে চা তো খাওয়া যাক—, বলে রবির জবাবের জন্যে ওয়েট না করে বিনয় ভেতরে চলে গেল। তখন রবির সামনে ফাঁকা দীঘিটা পড়ে আছে। তাতে নতুন শিবমন্দিরের ছায়া।

রবি পরিষ্কার বুঝলো, এই বিনয়ের জন্যেই সে আর তপতী এক হতে পারে নি একদিন। এখন সেই একদিনটা তার কাছে খুবই তুচ্ছ। অর্থ-হীন। কিন্তু তখন? তখন সে একদিন ছিল কালো গোলাপের চেয়েও কালো। তার কাঁটা হাতে ফুটলে যে রক্ত বেরোতো—তার রংও ছিল কালো। লাল নয়। গোলাপী নয়।

একা একা চুপ করে বসে আছেন? বাবা কোথায়?

তোমার খোঁজে দোতলায় গেলেন এই মাত্র।

আমি তো একতলাতে পাশের ঘরে হীটারে চায়ের জল চড়াচ্ছিলাম। এ সময়টায় আমরা কেউ মায়ের কাছে যাই না। মা এখন আহ্নিকে বসেন। মন্ত্র নিয়েছেন যে—

তোমাদের সারা বাড়িতেই মন্ত্র! বোসো।

না রবি। তুমি আমার কি করেছো দেখ। তাকিয়ে দেখ একবার।

এমন সুন্দর সকালে রবি পরিপূর্ণ চোখ তুলে তাকালো। তার দৃষ্টি আগলে তপতী তার সারা শরীরটা নিয়ে দাঁড়িয়ে। এত বড় বাড়িতে বোধহয় আর কোনো লোক থাকে না। দীঘির গায়ের পথ দিয়ে লোক যাচ্ছিল।

তারা গ্রিল ঘেরা বারান্দার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছিল না।
তখন তপতী তার আঁচল সরালো। কি করেছো তুমি রবি আমার ; কেউ যে শুকনো গলায় এমন আকুল করে কান্নার শব্দ ঢেলে দিতে পারে রবি তা জানতো না।
খারাপ কিসের তপতী ? আমার তো কিছুই দেওয়া হয় নি তোমাকে কোনোদিন।
তাই বলে এমন করে দেবে ? আমি এখন দাঁড়াই কোথায় ?
আমার জিনিস তোমার পথ আটকাবে না কোনোদিন।
এভাবে প্রতিশোধ নিলে রবি !
বলো, ভালোবাসা দিলে রবি ! আমার তো কোনো চিহ্নই নেই তোমার কাছে। তাই না তপতী ? রবি বলছিল, আর বুঝতে পারছিল, কত দিনকার পুরনো হিসেব—এইমাত্র যোগে মিলে গেল। একদম সরল অঙ্ক। সামান্য একটা স্টেপ এতদিন ভুল হয়ে যাওয়াতে মেলে নি।
তাই বলে রবি—
রবি পরিষ্কার শুনলো, একটা রাজহাঁস তার পুরো গলা খুলে দিয়ে ঠোঁট চিরে এইমাত্র গেয়ে উঠলো—রবি—

১৫

টুনি কিংবা বুবু—কেউ রবিকে রাজী করাতে পারলো না। সুজাতা বলল, চলো না। ওরা এত করে বলছে।
রবি বলল, না। তুমি ওদের নিয়ে ঘুরে এসো।
তা হয় নাকি ? ওরা ওদের বাবার সঙ্গে ঘুরতে চায়। তোমার কাছে ওরা যা পাবে—তা কি আমি দিতে পারি ?
তুমি তো ওদের মা সুজাতা।

তুমি ওদের বাবা।

আমার ভালো লাগছে না। ওদের নিয়ে বাইরে কোথায় ঘুরে এসো।

রবির এ কথার পর সুজাতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যে কোনো সাংসারিক গৃহস্থের মতোই বিবেক নামক সিরিঞ্জের খোঁচায় রবির ভেতরটা চুলকোতে লাগল। টুনি আর বুবু তার সঙ্গে বেড়াতে ভালোবাসে। নিয়ে গেলেই হোত। কিন্তু রবির ভেতরটা একটা অন্ধকার পাথরের নিচে পড়ে থেঁতলে যাচ্ছিল।

সে পাথরের নাম ঃ বিনয় বসু। যে হয়তো কোনোদিন তার শ্বশুর হতে পারতো। ছেলে স্বামী হারিয়ে দিয়ে যে কুন্দকে ন'দশ বছর ধরে ক্ল্যাসিকাল নাচ-গান শিখিয়েছে। সে কি শুধু কণ্ট্রাক্ট হাতাতে মক্কেলদের এক্সক্লুসিভ্ মনোরঞ্জনের জন্যে? একজন লোক কি এত আগে থেকে মতলব ভেঁজে এগোতে পারে? শয়তান কি এতটাই গোছালো? কিংবা লোকটাকে তো আমার এতটা খারাপ মনে করার কোনো কারণ নেই। সে তার স্বার্থ দেখেছে। বেকারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না। তাই আমার সঙ্গে তপতীর বিয়ে আটকেছিল—তপতীকে দূরে বিদেশে পড়তে পাঠিয়ে। তবু রবির ভেতরটা খচখচ করতে লাগলো। বেলা দশটাও বাজে নি। শীতে এসে রোদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। বেলা তিনটে নাগাদ রোদ নরম হলে, শীত ঝাঁপিয়ে পড়বে। সারা শহরে। ঘরে ঘরে। সেই কাল ভোরে রোদ উঠলে তবে নিস্তার।

সে নিজে এখন বসবার ঘরে বসে আছে। ফাঁকা বাড়ি। মেঝের কার্পেট থেকে সিলিং অবধি সর্বত্র বিনয়ের ছাপ। এ কার্পেট বিনয়ের টাকায়। সিলিংয়ের নতুন ঝোলানো আলোর ঝাড় বিনয়ের টাকায়। ফাইবার গ্লাসের বিল্ট-ইন আলমারি—তাও বিনয়ের লোক এসে বসিয়ে দিয়ে গেছে।

রবি বেড-কাম-সোফায় শুয়ে পড়লো। উপুড় হয়ে। জীবনের এতগুলো বছর চলে গেল। অথচ আমি কাজের মতো কোনো কাজ আজও করি

নি। জীবনের পেছনটা আবছা। সামনেটাও আবছা। বর্তমান একদম ফ্ল্যাট। তার কোথাও কোনো একটা ফুলও ফুটে নেই। এমন জীবনে কেন সন্তান? কেন স্ত্রী? কেন এমন এলাহী জীবনযাপন? এইজন্যে কি জীবনে এসেছিলাম?

আমি ধার্মিক নই। সৎ বলে দাবিও করছি না। কিন্তু আমি অধার্মিকও নই। মানুষের জন্যে আমার কষ্ট হয়। ভালোবাসা আসে। মায়া কাজ করে।

আমি রবিরঞ্জন গুহ—আমি সম্ভবত ধর্মহীনতায় ভুগছি। ধর্ম যদি আমার কাছে না আসে তবে আমি কি করব? এক অজানিত অদৃশ্য শক্তিকে ভগবান, ঈশ্বর বলে মানতে কেমন লজ্জা করে। অপমান লাগে। তার চেয়ে পাহাড় নদী, বড় সাইজের মেঘকে শক্তিমান, সুন্দর লাগে আমার। আমার জ্যান্ত ঈশ্বর ছিলেন আমার মা বাবা। তাঁদের জীবনের আলো আমার জীবনে চলে আসে।

সোফার বাইরে হাত ঝুলিয়ে দিয়ে রবি উপুড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

তেতলায় এষা তার দুই ভ্রূ আচ্ছা করে ভেজলিনে ভিজিয়ে নিয়ে সন্না দিয়ে ভ্রূ প্লাক করছিল। আয়নায় দাঁড়িয়ে। ভ্রূর রেখা সরু করা দরকার। ভিসন লিখে রাখার খাতাখানা আজ তিন মাস হল তোষকের নিচে। বের করা হয় নি।

চারতলায় কাচঘরে তখন সুবিনয় আর তপতী। একদম মুখোমুখি। কাচের বাইরে নিউ আলিপুরের মাঠ, বাড়ি, কালীঘাট রেল স্টেশন দিব্যি ক্যালেণ্ডারের ছবি হয়ে পড়ে আছে। সবুজ, লাল, খয়েরি—নানা রঙের রাস্তাঘাট, মানুষজন, গাড়িঘোড়া, রেল ইঞ্জিন, বনস্পতির কারখানা।

তপতী সোজাসুজি তাকালো। সুবিনয়ের চোখে চোখ রেখে বলল, আমি বীথির কাছে অ্যাবরশান করাবো। এ বয়সে অমি আর মা হতে চাই

না।

না। তা হয় না তপতী।

খুব হয়। আমাকেও তো বাঁচতে হবে। আমার একটা সম্মান আছে। তোমার কাছে। এষার কাছে। বাইরের পৃথিবীর কাছে। তাছাড়া—

তাছাড়া কি তপতী? প্রশ্ন করেও সুবিনয় বুঝলো, সে নিজে কিসের জ্বলুনিতে আপনাআপনি জ্বলে যাচ্ছে।

এতদিন পরে বাচ্চা হতে গিয়ে আমার প্রাণ নিয়েও তো টানাটানি হতে পারে। সেবারে এষার বেলায় মনে নেই?

এত কথা সুবিনয়ের কানে যাচ্ছিল না! সে অবাক্ হচ্ছিল—এ অবস্থায় তপতী এত পষ্টাপষ্টি কথা বলে কি করে?

বিশেষত এ কথা আজ পরিষ্কার—তপতীর পেটের ভেতরকার জিনিসটির বীজ সুবিনয় অন্তত বোনে নি। তার পরেও তপতী কি করে এত পরিষ্কার গলায় কথা বলে। ওর গলায় কান্না নেই। ভর নেই। সংকোচ নেই। চোখে এক ফোঁটা জলও নেই। দ্বিধাহীন, দৃঢ়।

সুবিনয় বলল, ডাক্তার ঠিক করবে—তুমি মা হবে কি হবে না।

পেটে ধরতেই তো মা হয়ে বসে আছি সুবিনয়। ও তো অলরেডি জানান দিয়েছে—আমি আসছি।

আসতে দাও তপতী। নতুন প্রাণের তো অপরাধ নেই। ওকে আমাদের স্বাগতম জানাতে বাধা কোথায়? বাধা দেওয়া বরং অধর্ম। আমরা না ধর্মের জীবন যাপন করছি।

সুবিনয়! তুমি তো একটা জিনিস জানতে চাইলে না।

আমি কিছু জানতে চাই না। ও সন্তানকে আমি নিতে রাজী।

আমি রাজী নই। এ কোনো ভালোবাসার জিনিস নয়। বিদ্বেষের জিনিস। ঘেন্নার জিনিস।—এখানে থেমে গেল তপতী। কান্না এসে ওর গলার দরজা জোর করে বন্ধ করে দিল। তারপর অনেক কষ্টে মাথা তুলে সুবিনয়ের দিকে তাকালো। সুবিনয় দেখলো, তার ধর্মপত্নীর

দু'চোখ পাতলা জলে ফিকে হয়ে যাচ্ছে। তার ভেতরেই তপতার গলা শুনতে পেল।

ওর বাবা কে জানো?

আমি জানতে চাই না তপতী।

অন্তত তুমি যে নও—সে কথা কি জানো?

কিছুতেই আমাব আর কিছু যায় আসে না। আমায় জানিয়ে তোমার কি লাভ তপতী?

লাভ নয়। এক রকমের সুখ। তুমি তো এ জন্মে মেয়েমানুষের শরীর পাবে না। তাই তুমি বুঝবে না। আচ্ছা তোমার কি আমাব ওপর রাগও হয় না? চুলের মুঠি ধরে আমায় বেব করে দাও না কেন?

আমি তোমায় ভালোবাসি তপতী। আমার যে আব কোনো রাস্তা নেই।

সে কথা তো রবিও বলতো! তোমার মতো একই গলায়—একই ভাবে। তোমরা পুরুষরা ভালোবাসার একটা মানেই জানো সুবিনয়। দখল। শুধু দখল। পুরোপুরি, শরীর দিয়ে। মন দিয়ে। চারদিক থেকে রাতা-রাতি দেওয়াল তুলে ফেলে। আমি নিশ্বাস ফেলতে পারছি না সুবিনয়। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

সুবিনয় এগিয়ে গিয়ে তপতীকে ধরলো। বেতের চেয়ারটায় বসিয়ে দিয়ে বলল, অস্থির হবার কিছু নেই। যে জিনিস যেমন—ঠিক সেভাবেই নিতে শেখো।

ওসব কথা অনেকদিন ধরে শুনে আসছি। এখন আর ভালো লাগে না। আগে বাবা বলতেন। এখন তুমি বল। ধ্যানের দিন আশ্রমের প্রধানরা সমাধিতে বসবার আগে বলেন। আমি একটা মানুষ তো বটে! আমার কাম আছে। আমার রাগ আছে। সুখ আছে। দুঃখ আছে সুবিনয়।

এ সময় আমাদের অচঞ্চল থাকতে হবে তপতী।

রাখো তোমার বুজরুকি। অনেক হয়েছে। আমি মরছি এখন আমার

জ্বালায়। এ মুখ নিয়ে আমি এষার সামনেও দাঁড়াতে পারবো না।
এষা তো জানে—এবারে তার ভাই হবে। আমায় বলেছে—প্র্যাম্ কিনে দিতে হবে, বাবা। ভোরবেলা আর বিকেলবেলা ওই মাঠের পাশের রাস্তায় ভাইকে বসিয়ে চাকা ঠেলে ঠেলে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে।
বসা অবস্থায় তপতী দু' হাতে দাঁড়ানো সুবিনয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে তাতে মুখ রাখলো। তারপর ভেতরকার দলাপাকানো কান্নার ঝাঁকুনিতে ফুঁপিয়ে উঠলো।

মুণ্ডেশ্বরীর মিঠে জল থেকে তিনটে—আর বক্রেশ্বরের বাওড় থেকে চারটে—মোট সাতটা রিভার লিফট পাম্প বসানোর কাজ সম্পূর্ণ করে বিনয় ট্রেজারিতে সরকারী চেক ভাঙালো। আসলে এই সাতটা পাম্প থেকে নদীর জলে প্রায় সাত হাজার একরে সেচ হওয়ার কথা। রাইটার্স থেকে কাজটা পেয়েছিল রবিদের কোম্পানি। সে-কাজের সাব-কনট্রাক্ট রবিদের হাত থেকে লুফে নিয়েছে বিনয় বসু।
রবির কোম্পানি সরাসরি কমিশন তো বিনয়ের বিল থেকে কেটে নেবেই। তাছাড়া বিনয়ের কাছে রবিরও পাওনা কম নয়। একেই বলে উপরি।
হাই টেনশন লাইন থেকে কানেকশান নিয়ে নদীর পারে বসানো বড় বড় পাম্প হাউস চালু করতে হয়েছে। মাঠের ভেতর। তার সিমেণ্ট বাঁধানো পাকা পাইপ লাইন। খরার সময় হাজার একরে নিশ্চিন্ত সেচের আয়োজন। কত কি যে হচ্ছে সারা দেশটা জুড়ে।
প্রথম প্রথম কাজে নেমে রবির খুব আনন্দ হোত। গর্ব হোত। সে এত বড় একটা বিরাট কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তখন বিনয় কোথায়। কাজের শেষে উপরিপাওনা ছিল—লোকাল চাষীদের আশীর্বাদ, ভালোবাসা।
এখন সে জায়গা ভরাট করে দিয়েছে বিনয়। বিনয় বসু। রবিদের

কোম্পানির বড় বড় কাজের সাব-কন্ট্রাক্টর। কোম্পানি কমিশন পায়। পায় রবিও। কাজের ওপর পার্সেন্টেজ।

চেক ভাঙাবার পর সেই পার্সেন্টেজ দিতে এসেই বিনয় অসময়ে রবির ঘুম ভাঙালো।

বুবু টুনিকে নিয়ে সুজাতা তখনো ফেরে নি। বেড-কাম-সোফার ওপর রবি উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছিল। কলিং বেলের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল রবির। দরজা খুলতে সামনে বিনয়। রবির ডাকের জন্যে একটুও ওয়েট না করে পায়ের মোকাসিনে গটগট শব্দ তুলে বিনয় সোজা এসে বসার ঘরের সোফায় বসলো। হাতের অ্যাটাচি খুলে নোটের গোছা টেবিলে রেখে বলল, গুনে নিন—পুরো সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার টাকা আছে। টোটাল ওয়ার্কের ওপর সাড়ে তিন পারসেন্ট হিসেবে—

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল রবি। তখনো সে কাঁচা ঘুমের ভেতরে ছিল। ফাঁকা বাড়ি। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকায় বুকের ডান দিকটায় ব্যথামতো লাগছে। বেলা দেড়টা দুটোর মরা আলোয় সারাটা বাড়ি এখন ভুতুড়ে। ড্রাইভার চন্দ্রা কাজের লোক এখন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গাড়িতে।

আস্তে বলল, বিনয়বাবু। ও টাকা আপনি নিয়ে যান।

কেন? রাগ করলেন নাকি। আচ্ছা। আরও এক হাজার টাকা রাখলাম টেবিলে। এটা আপনার গিন্নীর জন্যে দস্তুরি ওঁরও তো একটা হাতখরচ আছে—না কি—বলুন না! বলেই বিনয় হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো। তারপর নিজের রসিকতার তোড়ে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বিনয়—অ্যাটাচি হাতে। রবির মনে পড়ল—আজই বিনয়ের চেক ক্যাশ হওয়ার কথা ছিল। তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা। তাই অ্যাটাচির পেটটা অত মোটা।

খোলা দরজা বন্ধ করা হল না রবির। কাচের টেবিলের ওপর আধো অন্ধকারে মোট সাড়ে আটত্রিশ হাজার টাকার নোটের গোছা। টাকা এবং সে—এই দুটি জিনিস একদম অর্থহীন অবস্থায় দু' জায়গায় পড়ে

থাকলো। সে একজন মানুষ। তাই সে বুঝতে পারলো, ওই উঁচু হয়ে ওঠা নোটের থাকের সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ ওই জিনিসটা ছিল না বলেই—একদিন সে আর তপতী কাছাকাছি হতে পারে নি। ওই জিনিসটা এখন তার আছে বলেই—তার মায়ায়—তার সুখে—সে কয়েকটা পরিষ্কার সত্যের মুখোমুখি হতে পারছে না। যেমন—

তপতীর জন্যে !আমার একদিন কষ্ট ছিল ঠিকই। কিন্তু এখন আমার মনের ভেতরে তপতীর জায়গায় শুধু একটা পোড়া বাড়ির দাগ রয়েছে মাত্র। একথা তপতীকে বলা যায় না।

সুজাতার জন্যে আমার মনে কোনোদিনই তপতীর মতো ব্যথা ছিল না। কিন্তু সুজাতা এই জীবনে বুবু আর টুনিকে এনেছে। ওদের ছেড়ে আমি থাকতে পারি না। এটাও আমার বোধহয় এক রকমের দখলের লোভ।

টাকা আমাকে যেসব লোভ, সুখ, আরামের স্বাদ দিয়েছে—সো কলড্ ভালো থাকার ইচ্ছে আমার ভেতরে উসকে দিয়েছে—যাকে বলে কি না গুড লিভিংয়ের জন্যে আমার এখন বিনয়ের মতো মানুষের টাকা ছাড়া থাকার উপায় নেই।

অথচ আমি জানি এই টাকার সঙ্গে আমার আর কোনো যোগ নেই। এখন তপতীকে, সুজাতাকে, বিনয়কে, কুন্দকে সত্যি কথা বলে ফ্রেস করে আমার জীবন আবার শুরু করা দরকার।

উঠে গিয়ে খোলা দরজা আটকাবার ইচ্ছে করলো না রবির। নোটের থাকগুলো যেমন ছিল পড়ে থাকলো।

বীথিদের গ্যারাজের ওপর মেজানিন ফ্লোরটাও কার্পেটে মোড়া। এয়ার-কুলার বসানো। জরুরী অপারেশনের জন্যে সেখানেও বিরাট টেবিল। দেওয়াল জুড়ে কাচের র‍্যাকে স্টেরিলাইজড্ যন্ত্রপাতি ঝকঝক করছে।

টেবিল থেকে সাবধানে নামলো তপতী। নেমে চেয়ারে বসে বীথিকে বলল, কেমন দেখলি ?
বীথি খানিক চুপ কবে থেকে বলল, অ্যাববশন করাতে হলে আব দেবি ভালো নয় দিদি। কিন্তু কেন কবাবি ? তোব তো ছেলেও হতে পাবে।
আমাব আব ঝামেলা পছন্দ নয়। আমাদের এখন ধর্মেব জীবন বীথি। তোমায় যে ইঞ্জেকশনটা দিযেছিলাম—তাতে তো কোনো কাজ হল না। হলে, তোমাকে আব কনসিভ কবতে হোত না। আচ্ছা দিদি, একটা কথা বলবি ?
বল।
সেবাব এষা হওয়াব বেলায় সুবিনয়দাকে কত খুশি-খুশি দেখেছিলাম। কিন্তু এবাবে ?
কেন ? তোব জামাইবাবুকে দুঃখী দুঃখী দেখছিস ?
না। তা নয়। কিন্তু সেই ফুর্তি কোথায় ?
আমাদেব তো বয়স হল। ধ্যান, সমাধি, ভিসন—এখন আমাদেব জীবন। অচঞ্চল থাকাই আমাদের নিয়ম। মনস্থিব বাখাই আমাদেব কর্তব্য।
রাখো তো তোমাব বাজে কথাগুলো! তুমি অ্যাববশন কবাবে কেন দিদি ? সুবিনয়দাব মত আছে ?
তপতী হাসতে চাইলো। হাসি হল না। খুব আস্তে বলল, পুরুষরা কি সব জিনিস বোঝে ? তুই কি সনৎকে সব বলিস ?
অ্যাবরশানেব ব্যাপাব স্বামীকে কখন লুকোয় দিদি ? এ হাতে তো কম খালাস কবি নি! তুই আমাব দিদি। বাগ কবিস না। একটা কথা বলি। এ বাচ্চাটা কার ?
যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল তপতী। মানে ?
ওর বাবা কে দিদি ? নিশ্চয় সুবিনয়দা নয়।
কি বাজে বকছিস। বলতে বলতে কোনো রকমে চেয়ারের হাতল ধরে

তপতী ফিবে বসে পড়ল। প্রায় গুপ্ত ঘরের মতো এই নিঃশব্দ অপা-রেশন রুমে তার দুই কান বন্ধ হয়ে গেল।

বীথি তখন বলছিল, আমরা কেস দেখে বুঝি দিদি। প্রায় পনের বছর এ কাজ করে আসছি। ওর বাবা কিছুতেই সুবিনয়দা নয়। কে তোমার এমন করলো দিদি? বলতে বলতে বীথি নিজেই কেঁদে ফেলল। সে তখন তপতীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে। ঠাণ্ডা, নিঃশব্দ ঘরে ছায়াহীন উজ্জ্বল আলো। একটা সুবিধা—ক্লান্ত, অস্থির তপতীর কানে এর একটা কথাও যায় নি। সব সময় একটা ঠাণ্ডা ভয় তার ভেতরটাকে কুরুনি দিয়ে কুরে যাচ্ছিল।

দু' বোন সিঁড়ি দিয়ে বসবার ঘরে নামতে নামতে দেখলো, ওদের বাবা আর প্রশান্ত মেসো বসে। দু'জনে মিলে বাই রোডে বালুগাঁও হয়ে রম্ভা যাওয়ার রাস্তা নিয়ে কথা বলছে। ছোটো মেসো প্রশান্ত, বীথির দিকে তাকিয়ে বলল, দাদা একটা খবর এনেছেন। রম্ভা যাবি নাকি সনৎকে সঙ্গে নিয়ে? আমার আর একা একা ঘুরতে ভালো লাগে না।

বীথি গম্ভীর গলায় বলল, ভালো করে খবর নাও। তারপর না হয় যাওয়া যাবে।

প্রশান্ত বলল, তোদের বাবা তো পাকা লোক। আগে ওষুধ করতেন। এখন মাঠে মাঠে টিউবওয়েল, পাম্প, পাইপ লাইন করে বেড়ায়। তার খবর কখনো ভুল হয়? কি বলো বিনয়দা—

এখানে সায় পাবার জন্যে পাশের সোফার বিনয়ের উরুতে একটা থাপ্পড় দিতেই প্রশান্ত দেখলো, বিনয় খুব মন দিয়ে তারই বড় মেয়ে তপতীর দিকে তাকিয়ে আছে। তপতীর মুখ কিছু ভারী। চোখের নিচে অনেকটা জুড়ে কালি। মনে মনে প্রশান্ত নিজেকেই বলল, দাদার বড় মেয়েটা ভেতরে ভেতরে ভীষণ দুঃখী। বাইরে কোনো প্রকাশ নেই। কিন্তু তপুর চোখই তা বলে দেয়। তপু ওর ছোট মাসীর প্রায় সখী

ছিল। বয়সে শিপ্রার চেয়ে তপু অবশ্য কয়েক বছরের ছোট।

ছোট ভায়রা-ভাইয়েব থাপ্পড় খেয়ে বিনয় ঘুরে তাকালো। রম্ভা থেকে চিল্কার বুকের ভেতর চন্দ্রাকূট পাহাড় দেখা যায়। তাব কোলে হেলথ্ সেণ্টার। সেখানে স্টাফ নার্স একটি বাঙালী মেয়েব কথা শুনলাম। সঙ্গে তের চৌদ্দ বছবেব ছেলে নিয়ে থাকে। সধবাব পোশাক। তাইতো জেলেবা আমায বলল।

সে যে ছোট মাসী তা বুঝলে কি কবে বাবা?

ডেসক্রিপশনে। গান গায়। জেলেরা শুনেছে। জ্যোৎস্না রাতে নৌকো ভাড়া করে চিল্কাব দশ মাইল ভেতবে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কালী পাহাড়েব ঠাকুববাড়িতে পুজো দিতে যায়। হাবভাব, হাঁটাচলা যা শুনলাম, —তা তো আমাদের শিপ্রাই মনে হয়। সঙ্গে বয়েছে বাবলু।

প্রশান্ত বিনয়েব কথাগুলো একদম গিলছিল। পাবলে প্রশান্ত এক্ষুণি পাম্প থেকে তেল ভবে বম্ভায় উড়ে যায়। কিন্তু কোন্ দুঃখে শিপ্রা গিয়ে বাবলুকে নিয়ে হেলথ্ সেণ্টারে স্টাফ নার্স হয়ে লুকিয়ে থাকবে? নার্সের ট্রেনিং-ই বা নিল কবে? কোথায় নিল? কেন নিল? এসব কথা ভাবতে ভাবতে প্রশান্ত দেখলো, লম্বা কাঁচাপাকা চাপদাড়ি, ভাবী ভ্রূ, মোটা নাক, ভরন্ত কালো বংয়ের মুখ নিয়ে বিনয়দা পুবনো ছবিব শিবনাথ শাস্ত্রী হয়ে গেছে একদম।

বিনয় বসু তখন বাই রোডে রম্ভা যাওয়ার রাস্তার কথা সবিস্তারে বলে যাচ্ছিল।

তপতী বলল, উঠি, বীথি।

তার সঙ্গে বিনয়ও উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে তোর গাড়ি আছে?

না। তোমাদের জামাই নিয়ে বেরিয়েছে।

সুবিনয় কোথায়? কোর্টে?

না। একটা কনসাল্টেশনে ফার্ন রোডে সিনিয়রের বাড়িতে গেছে।

চল,' তোকে আমি দিয়ে আসি।

কোনো দরকার নেই বাবা। আমি ট্যাক্সি নিয়ে নেব।

চল না। এই তো এটুকু পথ।

গাড়ি নিজেই চালাচ্ছিল বিনয়। পাশে তপতী। ইম্‌পোর্টেড হার্ড টপ টয়োটা।

তপতী বলল, এটা কিনলে কবে বাবা?

এই তো গেল হপ্তায়। সস্তায় পেয়ে গেলাম মা। সিঙ্গল ওনার। অটোমেটিক গীয়ার।

কত পড়লো বাবা?

তেতাল্লিশ হাজার। ট্যাক্স, ইনসিওরেন্স নিয়ে ছেচল্লিশে দাঁড়ালো।

তপতী তার বাবার অভ্যেস জানে। কখনো হাজারের অঙ্ক পুরো বলে না। আশি, বাহাত্তর ইত্যাদি বললে বুঝে নিতে হবে—আশি হাজার। বাহাত্তর হাজার। বাবা তো আগে যখন জমিজায়গা বাড়িঘর কিনতো—তখন ঠিক এভাবেই শর্টে বলতো সাতানব্বই, একাশি, সাতান্ন।

তপতীদের বাড়ির সামনে এসে বিনয় বলল, চল তোকে ওপরে তুলে দিয়ে আসি।

কোনো দরকার নেই বাবা।

দিদিভাইয়ের সঙ্গে একটু দেখা করে যাই।

এষা এখন বাড়ি নেই বাবা। খুব সম্ভব পাঠভবনে বই পালটাতে গেছে।

বিনয় কোনো মানা শুনলো না। ফাঁকা তেতলায় উঠে প্রথম যে-কাজ করলো তাতে তপতী অবাক। আচমকা বিনয় তাকে ঘুরিয়ে মুখোমুখি করে নিল। দুই হাতে তার দুই কাঁধ ধরে সোজাসুজি বিনয় মেয়ের চোখে তাকালো। তুমি আবার মা হবে?

তপতী মাথা নামিয়ে নিল। চোখে জল এসে গেছে তার। বাপ হয়ে কেউ এত জোরে মেয়ের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়?

সত্যি করে বল। মা হবে? তোমাদের না ধর্মের জীবন?

ধর্মের সঙ্গে এর যোগ কোথায় বাবা ?

সাধন ভজনের পথে তো একটা বাধা। এখন তো তোমার সে বয়স আর নেই যে কাঁথা ঝিনুক নিয়ে পড়বে।

সে কি ! বাবা ? সব মা-ই তো তাই করে।

এষার বেলায় তোমার মা সব দেখতো। তুমি আঁচও পাও নি সেবাবে। এখন তিনি সারাদিন ধর্মে থাকেন।

এবারে না হয় পেলাম। আমরা তো তিন ভাই বোন। আমরা কি তোমার শিবসাধনার পথে বাধা ?

আমার কথা বাদ দাও তপু। আমি তো জীবন কাটিয়ে শেষ করে এনেছি। একটা কথা বোঝো না কেন ?

কি কথা বাবা ?

অধিক সন্তানে তোমার সাধনায় বিঘ্ন হবে। সম্পত্তি ভাগ হয়ে যায়। স্বস্তি থাকে না। একাগ্র হয়ে ঈশ্বর সাধনা হয় না। আবার প্রতিষ্ঠার প্রসারেও বাধা পড়ে। তুমি জীবনে এগিয়ে যেতে পারবে না।

তাই বলো বাবা ! হো হো করে হেসে উঠলো তপতী। সম্পত্তি ভাগ হয়ে যায় বাবা ! কোথায় ? গেল হপ্তাতেও তো তুমি গাড়ি কিনেছো। কিছুই তো কমে নি তোমার। ববং বাড়ছে দেখছি। তুমি এগিয়েই চলেছো !

তপতীর হাসিতে অল্প ঘাবড়ে গিয়েছিল বিনয়। সেটা কাটিয়ে অন্য দিক থেকে কথা টেনে এনে নিজেরই মেয়েকে চেপে ধরলো। তোমরা তো অবুঝ নও। কি করে আবার মা হতে চললে ?

আমাদের ব্যাপার আমাদের বুঝতে দাও।

তোমাদের ভালোর জন্যেই বলছিলাম মা। এবারে সুবিনয়কে তুমিই এপথে এনেছো নিশ্চয়।

তপতীর অনেকদিনের রাগ, অনেকদিনের ঘেন্না একসঙ্গে গলগল করে বেরিয়ে এলো। এই লোকটার ভালোবাসা মানে লোহার আদেশ। তা

মানতেই হবে। অথচ তার বাইরে ভালোবাসার মিথ্যে কোটিং। আজ তার এই অবস্থার জন্যে তপতীর মনে হল—সবচেয়ে দায়ী তারই বাবা। এই লোকটার জন্যেই—

তপতীর মুখে দিয়ে ফস করে বেরিয়ে এলো, দেশে দেশে ছোট মাসীকে খুঁজে বেড়াবার দায়িত্ব কে দিয়েছে তোমায়? আমি কিছু বুঝি না নাকি?

কি বুঝিস তুই?

আমায় ঘাঁটিয়ো না বাবা। ছোটমাসী থাকতে মাকে তুমি কি কষ্ট দিয়েছো মনে নেই?

একটা ভয় বিনয়কে কামড়ে ধরেছিল। তপতীর এ-কথায় সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। তাই আবার ভাববাচ্যে শুরু করে দিল। মেয়েরাই মা শক্তি। কিন্তু তাদের কামিনীগুণ সব সময় বড় হয়ে ওঠা ভালো নয়। কাম মানুষের কাজে—বিশেষতঃ সাধনার—পুরুষের কাজে বিঘ্ন ঘটায়। এখন কি তোমাদের জনক-জননী হবার দরকার ছিল কোনো? আমি তুমি তো একই ট্রাস্টি বোর্ডে আছি। আরও মানুষ এনে তাকে ভাগ করার কি কোনো প্রয়োজন ছিল মা—

তপতী ঘরে ঢোকার আগে ঘুরে দাঁড়াল। রাগে তার সারা শরীর ফুটছিল। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমি মা হতে চলেছি ঠিকই বাবা। কিন্তু ওর বাবা তোমাদের সুবিনয় নয়।

কি? কি বললি তপু? তোর এ সর্বনাশ কে করলো মা? কে ওর বাবা। বল এখুনি আমায়—

ঠিকই বলেছি বাবা। কেন? তুমি কি এমন অনিয়মের স্বাদ পাও নি কোনোদিন!

ফাঁকা বাড়ির ফাঁকা ঘরে ঢুকে তপতী বিনয়ের মুখের সামনে দরজা আটকে খিল তুলে দিল।

১৬

বেল টিপতেই দবজা খুলে গেল। রবি সঙ্গে সঙ্গে ভেতবে ঢুকে ছিটকিনি তুলে দিল। কুন্দর চোখে ভয়। তবু বহস্য কবে বলল, এখন যদি তোমাব বিনয়বাবু এখানে থাকতেন—

—নেই জেনেই এসেছি। এই ভব সন্ধ্যেবেলায় সে এখানে আসবে না।

এতক্ষণে রবির হাতে ঝোলানো বাজাবেব থলেব দিকে কুন্দব চোখ পড়লো। এই সন্ধ্যে সন্ধ্যে ছাইপাশ গিলতে পাববো না। কি এনেছো? হুইস্কি ? আনতে গেলে কেন ? ঘবে তো ছিলোই—

ববি কোনো কথা না বলে গটগট কবে কুন্দব শোবাব ঘবে ঢুকে গেল। পেছন পেছন কুন্দ ছুটে এলো। যাচ্ছো কোথায় ? আমাব শবীব খাবাপ। আজ আমি এখন ঘুমোবো। আমি কিছু কবতে পাববো না এখন।

তোমায় কুন্দ আমি গাইতে বলছি না। নাচতেও না। চুপটি করে বোসো আমার সামনে।

বসেও উসখুস কবছিল কুন্দ। রবির চোখে পড়লো। তুমি কাঁপছো কেন ?

না। কিছুই না তো।

সত্যি কথা বল কুন্দ। কি হয়েছে তোমাব। ববি সোজা গিয়ে কুন্দর সামনে দাঁড়ালো।

কুন্দ এবারে রবিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে হু হু কবে কেঁদে উঠলো। আজ রাতে আমায় খুন করে রেখে যাবে—

কি বলছ ?

হ্যাঁ রবি। প্রশান্ত আমার খোঁজ পেয়েছে।

কে প্রশান্ত ?

কুন্দ চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালো। আমার স্বামী। প্রশান্ত। এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল পরশু। আমি দেখতে পেয়ে ডাকলাম বারান্দা দিয়ে। লিফটম্যানকে, তোমার বিনয়বাবুর বলা আছে—আমায় যেন নিচে নামতে না দেয়। প্রশান্ত কি শুনতে পায়—শেষে পায়জোড়া তাক করে ফুটপাথে ছুঁড়ে দিলাম। থমকে পড়ে কুড়িয়ে নিয়ে ওপরে তাকাতেই আমায় চিনতে পারলো প্রশান্ত। সে মুখ যদি দেখতে ওর—

প্রশান্ত খুন করবে ?

ওমা ! সে কেন। লিফটম্যান বলে দিয়েছে তোমার বিনয়বাবুকে—

বিনয় খুন করবে ? সে জানলো কি করে ?

প্রশান্ত যে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছিল।

আমি তো লিফট দিয়ে উঠে আসি।

তোমার জন্যে কোনো বারণ নেই বিনয়বাবুর। এক এক বছর এরকম এক এক জনের জন্যে ওর কোনো বারণ থাকে না।

রবি বিড়বিড় করে বলল, বুঝেছি। এ-বছর আমার সুবাদে বিনয়ের টিউবওয়েল পাম্প বসছে অনেকগুলো। কুন্দর দিকে তাকালো রবি। প্রশান্ত এসেছিল—তা জানে বিনয় ?

না।—তা জানে না। ভেবেছে—আর অন্য কোনো পুরুষ। তাতেই এই অবস্থা।

প্রশান্তবাবুর সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে কোনো ?

না রবি। সে সুযোগ হল কোথায়। লিফট চালিয়ে লোকটা ওপরে উঠে এলো। আমি দোর আটকে দিলাম।

তুমি তো একদিন বিনয়ের ছিলে—

ছিলাম। না থেকে কোনো উপায় ছিল না রবি।

প্রশান্তকে বলতে পারবে ?

খুব পারবো।

প্রশান্ত তোমায় নেবে?

ও যে কি ভালো তা যদি তুমি জানতে—। এখানে হঠাৎ থেমে পড়ে কুন্দ বলল, বিনয়দা আমার কে হয় জানো না?

না তো।

সত্যি জানো না?

না কুন্দ।

সময় হলে জানবে।

তোমায় কেউ খুন করতে পারবে না।

কুন্দ হো হো করে হেসে উঠলো। কেন? তুমি বাঁচাবে আমাকে? হয়েছে! তুমিও প্রেমে পড়লে শেষে।

না কুন্দ। আমি তোমার প্রেমে পড়ি নি। তুমি শিওর থাকতে পাবো।

নাঃ! ভাবলাম যদি আমার গান শুনে, নাচ দেখে প্রেমে পড়ে যাও। গতবারে ইরিগেশনের এক বুড়ো ইঞ্জিনিয়ারের সে কি নাছোড় অবস্থা!

আমার বেশী সময় নেই কুন্দ। ওই থলেটা রেখে দাও সাবধানে।

কুন্দ তার সোফা থেকে না উঠেই বলল, কোনো মদ আমার আর দরকার নেই। ও তুমি নিয়ে যাও।

হুইস্কি, রাম নয়। খুলে দেখো।

কুন্দ উঠে গিয়ে ব্যাগটার ভেতর হাত গলিয়েই তক্তপোষের ওপর সব ঢেলে দিল। এত টাকা! কোথায় পেলে? আমি কি করবো?

তুমি রাখো। মোট সাড়ে আটত্রিশ হাজার টাকা আছে।

কোথায় পেলে?

তোমার জানার দরকার নেই। ভয় নেই—এ টাকা চোরাই টাকা নয়। সৎ পথেও আসে নি অবশ্য। বিপদে পড়লে এ টাকা নিয়ে তুমি দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে সংসার পাততে পারবে নতুন করে।

কুন্দ রবির কাছে এসে ওর বুকে হাত রাখলো। টাকার দরকার নেই

আমার। তুমি নিয়ে যাও। আমি কোথাও পালাবো না। আজ আমি বাঁচলে প্রশান্ত আমায় ঠিক খুঁজে বের করবে। ও যে বেঁচে আছে আমি ভাবতেই পারি নি।

তবু বলছি কুন্দ—টাকাটা তুমি গুছিয়ে রাখো। তোমার কাজে লাগতে পারে। বিনয় যে সুবিধের লোক নয়—তা তো আমরা জানি।

চলে যাচ্ছো ?

হ্যাঁ। দোর আটকে দাও। আমি আবার আসবো। বলেও দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল রবি। একটা কথা কথা কুন্দ। তোমার ছেলেও বেঁচে আছে—

কি ? কি বললে রবি ?

হ্যাঁ। আমার ধারণা বেঁচে আছে।

কুন্দ কোনো কথা বলতে পারলো না। আধ ভেজানো দরজাও আটকাতে ভুলে গেল। যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়েই একা একা চোখের জল ফেলতে লাগলো। মোছার জন্যে ওর হাতও উঠলো না।

ফেরার পথে ড্রাইভারকে রবি বলল, চন্দ্রা। হাইকোর্ট চল।

এখন তো আদালত বন্ধ বাবু।

চল না।

নির্জন ওল্ড পোস্টঅফিস স্ট্রীটের সারা দিনের জমজমাট ভাব এখন নেই। কয়েকটা তিনতলা চারতলা বাড়িতে আলো জ্বলছে। সব অ্যাটর্নি বাড়ি। সলিসিটরদের মহল।

সাত নম্বর বাড়ির তেতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল রবি। ফোনগাইড দেখে সুবিনয়ের অফিসের ঠিকানা রবির জানা। বিশেষ খুঁজতে হল না। বিরাট গ্লাসটপ টেবিলে ঢাকা আলোর নিচে আইনের বই খুলে সুবিনয় বসেছিল। প্রায় ধ্যানস্থ। সারা অফিস ঘর তখন ফাঁকা।

রবি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চমকে উঠলো সুবিনয়। আমি রবি—

অন্ধকারের ভেতর টেবিল ল্যাম্পের আলোর আভায় ভালো করে

তাকিয়ে সুবিনয় বলল, ওঃ! বসুন।
রবি বসেই বলল, আমি আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম। ভীষণ জরুরী।
সে হবে 'খন। বসুন তো আগে। কদ্দিন পরে দেখা হল বলুন তো?
রবি কোনো জবাব না দিয়ে বলল, আমি কিছু কথা এখুনি বলে ফেলতে চাই।
সে হবে। তাড়া কিসের। চা না কফি খাবেন?
এখন কিছুই খাবো না। তপতীর ও অবস্থার জন্যে আমি দায়ী।
জানি। কফি খাবেন?
এবারে ধাক্কা খেল। সে টের পেল, তার পা টেবিলের নিচে একটু কাঁপছে। থবথর করে। নিজেকে যতটা পারে সংযত করে রবি বলল, আপনি ইচ্ছে করলে আমায় খুব করে অপমান করতে পারেন। আমি কোনো বাধা দেব না।
না না, সেসব নাটকের কোনো দরকার নেই। আমি তো জানতাম।
আপনি জানতেন?
সব জানতাম। জয়পুরের জঙ্গলে পিকনিকের আগের রাত থেকেই জানতাম। আমাদের দীক্ষার বড় কথা অচঞ্চল থাকতে হবে। আমি তো গোড়া থেকেই অচঞ্চল আছি।
শুধু অচঞ্চল থাকাই আপনার মোক্ষ?
চাঞ্চল্য আমায় কি দিতে পারে রবিবাবু?
তবু। আপনার স্ত্রী।
আমার স্ত্রীকে আপনি ভালোবেসেছিলেন। বিয়ে করেছি আমি। পাশাপাশি থাকলে একজন আরেকজনকে ভালোবাসবেই। তাই বলে তপতী তো এ পৃথিবীর বাইরের জিনিস নয়। তারও ক্ষয় আছে। মানস অতিক্রান্ত অবস্থার স্বাদ পেলে আপনারও এসব খুব বড় মনে হবে না।

তবু তপতী আপনার—

আপনারও রবিবাবু তপতী কম কিছু নয়। তা নয়তো এতটা ছুটে আসতেন। আমিও তপতীকে ভালোবাসি। ওর ভালোমন্দ আমারও ভাববার বিষয়। কিন্তু তাই বলে একটা নতুন প্রাণকে নষ্ট করবো কোন্ সুবাদে? ববং একটা কাজ করতে পারেন আপনি। আমি অনেক ভেবেছি। আপনাকেই বলা যায়। আসলে আপনাব মতো ভালো লোক তো হয় না—

আমায় আর লজ্জা দেবেন না সুবিনয়।

এটা লজ্জার কিছু নয়। আপনার স্ত্রীকে আগে জিজ্ঞাসা করুন।

রবি মুখ তুলে সরাসরি তাকালো। অ্যাটর্নি বাড়ির ফাঁকা ঘর। র‍্যাকে নম্বর লাগানো ঘরে মামলার নথি সারি সারি। কি বলবো?

তপতীর গর্ভে আপনার সন্তান তিনি কি নেবেন?

রবি শুনতে শুনতে পাথর হয়ে গেল। এদিকটা সে এখনো ভাবে নি। সোজাসুজি সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ধর্মহীন মানুষ সুবিনয়। আমার কোনো শিক্ষা নেই। তোমার কাছে হাতে খড়ি নিচ্ছি বোধহয়।

না না। তেমন কিছু বড় জিনিস নয়। তাড়াতাড়িরও কিছু নেই। এখনো তো লম্বা সময় পড়ে আছে। তুমি বরং তোমার বউকে ধীরে সুস্থে জিজ্ঞাসা কোরো। তপতীর জীবনের চেয়ে ওর নতুন বাচ্চার জীবনের দাম আমার কাছে কিছু কম নয়। তুমি না এলেও আমি তোমার কাছে শীগগিরি একদিন যেতাম। দু'জনে পরামর্শ করে নিতাম। জীবন তো হেলাফেলার জিনিস নয়। তোমার মতো ভালো বন্ধু আমি কোথায় পাবো?

শোবার ঘরে দু'টো বিড়াল ছানা আর একটা উলের ঘুঁটি নিয়ে সুজাতা বসেছিল। রাত আটটাও বাজে নি। রবি বাড়ি ঢুকতেই বুবু বলল, বাবা তোমার গাড়িটা দেবে একটু। টুনিকে নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি

যাবো। জ্বর হয়েছে বোধ হয়। ক'দিন আসছেন না।

চন্দ্রাকে সাবধানে চালাতে বলে প্রায় পা টিপে টিপে শোবার ঘরে চলে এসেছে রবি।

উলের কাঁটা চালাতে চালাতে সুজাতা ট্রানজিস্টরে গান শুনছিল। রবিকে দেখে ট্রানজিস্টরটা বন্ধ করে দিল। তোমায় এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

রবি কোনো জবাব দিল না। মনে মনে বলল, আমার যে কি যাচ্ছে—তা যদি জানতে!

কিছু খাও নি অফিসে?

এবারও রবি কোনো জবাব দিল না। নিজেকেই মনে মনে বলল, আমাকে বিশ্বাস করে এতটা নিশ্চিন্ত থাকো কি করে? এখুনি আমি তোমাকে যা বলবো—তা শুনে তোমার এই সুখী গৃহকোণ মুহূর্তে তছনচ হয়ে যাবে। রবি এবার আচমকাই বলল, সুজাতা। আমাব একটা সত্যি কথা তোমাকে বলতেই হবে। না বলে কোনো উপায় নেই আমার। শুধু তোমাকেই বলতে পারি।

তা বলবে। তাতে আর কি আছে! এত তাড়া কিসের? জুতো জামা ছাড়ো আগে।

না এখুনি বলৰো তোমায়।

তোমার যা ইচ্ছে।

বলতে গিয়ে রবি দেখলো, সে কিছুই বলতে পারছে না। সারা ঘর জুড়ে শব্দহীন গতিতে পাথব এসে ভরে যাচ্ছে।

কোথায়? কিছু বলছো না তো?

আমি যদি আবার বাবা হই—

এ বয়সে আমি আর পারবো না। লোক হাসিয়ে লাভ! ঝামেলাও তো কম নয়।

অন্য কেউ যদি ঝামেলা পোহায়—

কি বলছো তুমি ?

ঠিকই বলছি সুজাতা। আমি অনেকদিন পরে আবার বাবা হতে চলেছি।

সুজাতার চোখের সামনে সাবাটা ঘর ডানদিকে কাত হয়ে পড়লো। তার ভেতরেই সে তক্তপোশের ওপর সোজা হয়ে বসে পাশেই-বসে-থাকা রবির দু'খানা কাঁধ শক্ত করে ধরলো। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমায় খুলে বল শীগ্‌গিরি।

তপতী মা হবে সুজাতা।

তখনো সুজাতা রবির মুখের দিকে তাকিয়ে। রবি দেখলো ওর মুখ-খানা, সন্ধ্যার কাজলের টিপ—সবকিছু একটু একটু করে ভেঙে তুবড়ে যাচ্ছে। তবু তাকে বলতে হল, সে সন্তানের বাবা আমি সুজাতা। আমি কিছুই লুকোবো না তোমার কাছে।

এবারে সুজাতা কিছুই করলো না। খুব আস্তে জানতে চাইলো, কি করে হল ব্যাপারটা ?

আমি বাঁকাদহ গিয়েছিলাম অফিসের কাজে—মনে আছে নিশ্চয়।

হ্যাঁ। তারপর থেকেই তুমি কেমন পালটে যাচ্ছো। চুপচাপ বসে ভাবো। তারপর থেকে তোমায় উপুরি পয়সা দিতে লাগলো বিনয়।

আরো অনেক কিছু তুমি আস্তে আস্তে শুনবে। সেজন্যে তৈরি থেকো।

আমি কিছুই আর শুনতে চাই না। আমাদের কি খুব বড়লোক হওয়ার দরকার ছিল কোনো ? কি দরকার ছিল তোমার ওইসব খারাপ পয়সার ?

সে-হিসেব আমাকে কোথাও দিতেই হবে একদিন। হয়তো কোন্ ধানক্ষেতের মাঠে। চাষী যখন খারাপ পাইপলাইনের দরুন ফলন্ত ধানে জলের অভাবে দাঁড়িয়ে আমায় ডাকবে। লম্বা মাঠের আলের ওপর দিয়ে আমি দৌড়ে যাবো। সামনে টানা দশ মাইল ধানক্ষেত। তার শেষে মেঘ সাজানো দিগন্ত।

আর কবিতা কোরো না। তোমাব লজ্জা করছে না। কোনো চরিত্র নেই তোমার। ছিঃ। ছিঃ।

তুমি আমায় যা ইচ্ছে বলতে পাবো। আজ আমি শুধু সত্যি কথা বলবো। নির্জলা সত্যি। সেজন্যে আমাব যা হয় হবে সুজাতা। আমি তো সেদিন বাঁকাদহে তপতীকে একটুও ভালোবাসি নি।

তবে?

আমাব ভেতব তখন ওর জন্যে ঘেন্না ছিল। বাগ ছিল।

বলো লোভ ছিল।

না সুজাতা। ববং শোধবোধ কবতে চেয়েছিলাম হযতো।

শোধ?

প্রতিশোধ বলতে পাবো সুজাতা।

না ভালোবাসা। বলেও সুজাতা ববিব মুখের দিকে তাকাতে পাবলো না। তখন ববিব সারা শবীব মনেব কষ্ট মুখে এসে ওব চোখ নাক সব-কিছু ছিন্নভিন্ন কবে দিচ্ছিল।

তপতী বা কি। এত লোভা।

না। তা নয় তপতী। ওব কোনো উপায ছিল না সুজাতা। আমাবই অজান্তে এই আমিই ওকে নিরুপায কবে তুলেছিলাম। ও সাবধান হতে ভুলে গিয়েছিল।

তাহলে তো তুমি একজন পাকা খেলোয়াড়।

তুমি আমায় যা ইচ্ছে বলতে পাবো আজ। আমি বুঝেছি আমাব এতদিনকাব বিষাদে যে তপতা একা একটা পাখি হয়ে উড়ে আসছিল—যাকে নিয়ে আমার ভালোবাসাব অপমান প্রায় খর্ব হযে মাথা তুলে উঠছিল—এই পৃথিবীর জীবনের পাশে তার কানাকড়িও দাম নেই। তার চেয়ে অনেক বেশী দাম—যে প্রাণ আসবে, আসতে চাইছে—তাব। সে শিশু তো কোনো দোষ করে নি আমাদেব কাছে। আমাকে আরেকটু পবিষ্কাব হয়ে উঠে দাঁড়াতে দাও সুজাতা। সে তুমিই পাবো

শুধু। চরিত্র হাতের আইসক্রিম ? হাত ফসকে রাস্তায় পড়ে গেলেই ধুলোয় ময়লা হয়ে যাবে সুজাতা ? আমার হয়তো এরকম একটা অবস্থা দরকার ছিল সুজাতা। নয়তো আজ থেকে বিশ বছর পরেও কোনো-দিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে বিছানায় উঠে বসে চেঁচাতাম—তপতী ! তপতী আছো !

তার চেয়ে এই ভালো হল সুজাতা। এই এতদিনকার জমাট বিষাদ, ক্ষোভ, অপমান ওই শিশু এক দমকায় পালটে দিল। তপতী এখন আর আমার কেউ নয়। কেউ ছিল না কোনোদিন—তা আমি বুঝতে পেরেছি সুজাতা।

আমি অতশত বুঝি না। বাচ্চাটাকে মেরে না ফেলে শেষে। আমার তো ভয় করছে ওগো।

ওঃ ! সুজাতা ! তুমি আমায় বাঁচালে। তুমি যে কি ভালো।

আঃ। ছাড়ো এখন। ও কি !

সুবিনয় যে কি ভালো লোক—তুমি ভাবতে পারবে না।

আমি তো অনেক জিনিসই ভাবতে পারি নি আগে। আমি কি নিজেকে সব সময় জানতে পারি আগে থেকে ?

তবে শোন। বিনয়বাবু কে জানো ? আমাদের তপতীর বাবা।

তপতীর বাবা ?

১৭

অনেকদিন পরে সুজাতাকে নিয়ে ছাদে বসলো রবি। সামনেই সন্ধ্যে রাতের আলো মাখানো কলকাতা। দু'জন কেউ কারও মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। রবি দেখলো, সুজাতার মাথা ঘিরে কলকাতার আলোর আভা। এই শহরের নিজের একটা আলো আছে। নিজের

একটা মেঘ আছে। বাইরে থেকে কলকাতার দিকে এগোবার সময় রবি বিকেলের দিকে লক্ষ্য করেছে—সারা শহরের নিশ্বাস, প্রশ্বাস, ধোঁয়া, ধুলো আকাশে উঠে গিয়ে শূন্যে মেঘের একটা বাঁধ তৈরি হয়েছে। আবার গভীর রাতে হাইওয়ে ধরে কলকাতার দিকে ছুটে যাবার সময় গাড়িতে বসে দেখতে পেয়েছে রবি—অনেক আগে থেকেই নিঃঝুম রাতের কলকাতার গা দিয়ে আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়ছে।

ঠিক এই মুহূর্তে রবির চোখেব সামনে একটা ছবি ভেসে উঠলো। সাগরতীরে গুরুদেব তাঁর সাধনগৃহে ধ্যানে বসেছেন। গুরুদেবের জীবনী পড়তে দিয়েছিল তপতী। তাতে পেয়েছে ছবিটা। সাগরের ঢেউ এসে চারদিকের সবকিছুতে ঢেউয়ের চাপড় মারছে। অথচ ঢেউয়েব আওতায় সাধনগৃহের বারান্দা বাঁচিয়ে ঢেউগুলো দু'পাশে গিয়ে আছড়ে পড়ছে। ঘাটাঢেউয়ের সাদা জলরাশির মাঝখানে গুরুদেব তাঁর সাধন-গৃহে ধ্যানে অচঞ্চল। এই ছবিটা বারবার তার মনে ভেসে ওঠে। কেন ওঠে তা জানে না রবি। তার কোনো দীক্ষা নেই। তার কোনো শিক্ষা নেই। তার কোনো গুরু নেই। নেই কোনো ঈশ্বর। তবু এই ছবিটা তার ভেতরটা কেমন করে দেয় এক এক সময়। আজকাল বই পড়তে পড়তে তার খিদে পায়। ভীষণ খিদে পায়। ভীষণ খিদে। তখন যা পায় তাই খেয়ে ফেলে।

রবির খুব ভয় হল। তাহলে কি আমার কোনো গুরুর দরকার হবে? ঈশ্বরের? আমার জীবন্ত ঈশ্বর আমার বাবা মা। একদা তপতীকে আমার ঈশ্বর মনে হয়েছিল। এ রকম মনে হওয়াতে কখনো ভাবি নি যে আমি হেরে গেলাম। কিন্তু আজ তপতীর গুরুদেবের কথা মনে হচ্ছে বারবার। আজ কেন মনে হচ্ছে—আমারই মা বাবা। যাঁরা আমাকে পৃথিবীতে এনেছেন।

এত কথা সুজাতাকে বলা যায় না। ওকেও আমি কখনো কখনো ঈশ্বর ভেবেছি। কিংবা ঠিক ঈশ্বর বা ভগবান না বলে বলা উচিত—সুন্দর

একখানা মেঘ বা শক্তিশালী একটি নদী। আসলে সুন্দর শক্তির জিনিসকে আমি ঠিক ভাবতে পারি না। তার চেয়ে বেশী কিছু। সে হয়তো ভগবান।

এষার ভিসনের খাতা একদা ভান মনে হয়েছিল আমার। কিন্তু এখন তো দেখছি এক একটা ছবিই সাবা অন্ধকারে আমার একমাত্র আঁকড়ে ধরবার জিনিস।

তুমি একাজ করলে কেন ? কেন করতে গেলে ?

তপতীর ওপর আমার ভীষণ বিদ্বেষ ছিল সুজাতা। যাকে আমি মনে করতাম—আমার অপমানিত ভালোবাসা !

এই তোমার ভালোবাসা !

আসলে রাগ সুজাতা। কিংবা কঠিন রাগ।

কার ওপর রাগ করতে হয় তাও জানো না ! এমন করে সুজাতা কথাটা বলল—রবির সারা ভেতরটা ঝনঝন করে বেজে উঠলো। শহর থেকে অনেক উঁচুতে আকাশের মাঝখানটায় তিন চারটে তারা আড্ডা দিচ্ছিল। তারা এইমাত্র রবিকে দেখতে পেল। দেখতে পেয়েই ওরা খানিকটা আলো রবির জন্যে পাঠিয়ে দিল। রবিকে ডাকলো। এই রবি ? রবি ! আমাদেব এই আলো ধরে উঠে এসো। আমরা হাত বাড়িয়ে আছি।

ঠিক এই সময় সুজাতা দেখলো, তার রবির দুই চোখের কোণে আলোর দুটো টলটলে ফুটকি। সে আর কিছু না করে তার বিয়ে করা স্বামীকে যত জোরে পারে জড়িয়ে ধরল। রবি তখন অচঞ্চল। খুব আস্তে বলল, কঠিন রাগ অনেকদিন ধরে পুষে রেখেছিলাম। আমার ভালোবাসাব অপমানের নাম—রাগ। তা ছিল বলেই আমি পাকাপাকি তপতীকে মুছে ফেলতে পারছি। এখন পৃথিবীতে তপতী যে বাতাসটুকু খরচ করে—তা বাদ দিয়ে বাকীটাই আমার পৃথিবী। কিংবা আমার দুনিয়ায় তপতী বলে কেউ নেই। ওই নতুন প্রাণটুকু এই গভীর শিক্ষা দিল আমায়।

আহা ! বাচ্চাটাকে যেন কিছু করে না বসে ওরা। তুমি একটু দেখো ওগো—
সুজাতার সিঁথিতে নিজের চিবুকটা চেপে বসালো রবি। তুমি যে কত ভালো সুজাতা—তা তুমি জানো না। তুমি একদম নিঃশব্দে এক এক সময় এত ভালো—যা আমরা কেউ চেষ্টা করেও পারি না।
দুজনকেই সরে বসতে হল। বুবু ওপরে উঠে এসেছে। সিধে সামনে এসে বলল,তোমরা অন্ধকারে দু'জনে বসে কি করছো? বাবাতোমারটেলিফোন এসেছে নিচে—
রবি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবলো, সুজাতার সঙ্গে সুবিনয়ের একবার দেখা হলে ভালো হোত। টেলিফোন তুলতেই ওপাশ থেকে তপতী বলল, আমায় বাঁচাও রবি। আমি আর পারছিনে। একবার এসে দেখো –আমার তুমি কি করেছো। আমি যে মুখ দেখতে পারছিনে কোথাও।
তোমার জন্য আমার আর কোনো রাগ নেই তপতী। এখন যা আছে তার নাম মায়া—এক জায়গার পাশাপাশি থাকার নিয়মে কিছু দায়িত্ব।
আমি কিছু বুঝতে পারছিনে রবি। তোমার কথার কোনো মানে বুঝতে পারছিনে আমি। আমার মাথার ঠিক নেই। আমি যে কোনো কাজ করে বসতে পারি এখন। এখন আর অ্যাবরশনেরও সুযোগ নেই। যে আসছে তাকে পৃথিবীর আলো দেখাতেই হবে। আমি যে কি করে বসি—আমার মাথার কোনো ঠিক নেই।
মাথা তোমার ঠাণ্ডা রাখতেই হবে তপতী। সব জিনিসের জন্যে দাম ঠিক করা থাকে।
আর কঠিন কথা বোলো না এখন। আমি ভীষণ বিপদে আছি।
সুবিনয়বাবু ফিরেছেন কোর্ট থেকে ?
এখনো ফেরে নি। আজ যে কেন দেরি হচ্ছে বুঝতে পারছি না।
একটু দেরিই হবে আজ ওর বাড়ি ফিরতে।

কেন রবি ? কেন ? সুবিনয়ের আবার কি ক্ষতি করলে তুমি ?

টেলিফোনের সামনেই রবির মুখখানা কালো হয়ে গেল। খুব আস্তে বলল, আমি কি শুধু ক্ষতিই করি ?

হেঁয়ালি রাখো। আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছে। আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। খুলে বল রবি। সুবিনয়ের আবার কি করলে। আমার মাথার ঠিক নেই। আমায় একটু দয়া কর রবি। কতকাল আগে কবে তোমাব কি করেছি—সেজন্যে এত শাস্তি। এত শাস্তি রবি ? আমার যাকে চাই—তাকে পেতেই হবে—এব নাম ভালোবাসা নয় রবি। এব নাম গর্ব। এর নাম দম্ভ। এর নাম দখল।

রবি বুঝলো, টেলিফোনে নারী নামে একটি সাপ হিস হিস করে ঈথার তরঙ্গে স্রেফ পার্থিব থুথু ছিটাচ্ছে। খুব আস্তে বলল, আমি পুরনো হিসেব কষতে বসি নি তপতী। আমি সব হিসেবের বাইরে এখন। আজ আমি পুরনো সব কিছুর বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। আমি সুবিনয়কে সব বলেছি—

কি বলেছো রবি ? আমার নতুন কি সর্বনাশ করলে আবার ?

ওভাবে দেখো না তপতী। ক্ষতি, সর্বনাশ, শাস্তি—এসব কথা ভুলে যাও। আমি সুবিনয়কে, আমার স্ত্রীকে সত্যি কথা বলতে পেরেছি। তোমার ভেতরকার নতুন প্রাণীর জনক আমি—আমি রবিরঞ্জন গুহ। একদা যে তোমাকে ঈশ্বর ভেবেছিল। যে এখন তোমার চেয়ে অনেক সহজে একটা রিক্সা নিয়ে ভগবানের পাড়ায় চলে যেতে পারে।

বাজে কথা রাখো। কি বলেছো সুবিনয়কে ?

সত্যি কথা।

সব বলেছো ?

সবাআর কতটুকুই বা! সুবিনয়বাবু আন্দাজ ঠিকই করেছিলেন—তোমার এ অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী।

ওঃ ! আমি মরে যাবো রবি। তুমি এ কি করলে। আমি তো কিছুই

বলি নি সুবিনয়কে। এখন সে কোথায় গেল? তাকে এখন আমি কোথায় খুঁজবো? তার মনের অবস্থা কি হচ্ছে কে জানে—

আমার মনের অবস্থা এত দিন কি হয়েছে—তার খোঁজ নিয়েছো কোনো-দিন?

আমায় দয়া করো রবি। আমায় ক্ষমা করো।

একবারও তো জানতে চাইলে না—আমার বউ কীভাবে খবরটা নিয়েছে। সে-ও তো তোমারই মতো একজনের বউ।

আমি কিছু ঠিক করতে পারছিনে রবি। দোষ হলে ক্ষমা করে দাও আমায়। সুবিনয়কে বাড়ি ফিরিয়ে আনো। ও নিশ্চয় আর কোনোদিন ফিরবে না।

রবি রিসিভারে একজন মেয়েলোকের কান্না আর সহ্য করতে পারছিল না। কান থেকে রিসিভারটা খানিকক্ষণ সরিয়ে রাখলো। তারপর কাছে এনে বললো, আর খানিকবাদেই সুবিনয়বাবু নিশ্চয় ফিরে যাবেন। ফিরে যাবেনই তপতী। কারণ, তার যে কিছু দরকারী কথা আছে তোমার সঙ্গে। তাকে বলতেই হবে। খুব জরুরী কথা।

কি কথা? আমি বাঁচবো না রবি। আমি আর সুবিনয়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবো না।

পারবে। তোমায় অচঞ্চল থাকতে হবে। সুবিনয় তোমায় সব বলবে। একটা নতুন প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলা চলে না।

আমি কিছু বুঝতে পারছিনে রবি। আমি ভীষণ অন্ধকারে—

কোনো ভয় নেই। সাবধানে থেকো। এখন তো কোনো উত্তেজনাই ভালো নয়।

বাজে কথা রাখো। আমায় বাঁচাও রবি।

আজই রাতে আমি একজন মহিলাকে বাঁচাবো। ইচ্ছে হলে তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পারো।

আবার কাকে কি করেছো?

ভয় নেই তপতী ! তার সঙ্গে আমার সেরকম কোনো সম্পর্ক নেই।

আমি জানতে চাইনে রবি। সুবিনয়কে কি বলেছো শুধু সেটুকু জানতে চাই আমি। ওর সামনে আমি অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়াতে পারবো না।

তাহলে এক কাজ করো। পারবে ?

কি ?

গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন সুবিনয়বাবু ?

আজকাল মিনিবাসে কোর্টে যান।

ভালোই হল। ড্রাইভারকে বলবে—পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসের সামনে দাঁড়াতে। আমি থাকবো।

এই রাতে ? এখন ?

ভয় নেই। নতুন কোনো বিপদের ভয় নেই আর তোমার। চলে এসো। আমি তো কোনোদিন তোমার বন্ধু ছিলাম।

রিসিভার নামিয়ে রাখার সময় রবির চোখে পড়ল, সুজাতা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। মুখটা চিন্তিত। রবির দিকে তাকিয়ে বলল, সাবধানে থাকতে বলে ভালো করেছো। এই সময়টা মন প্রফুল্ল রাখতে হয়।

রবি অবাক্ হয়ে সুজাতাকে দেখলো। এই রমণীকে সে বিন্দুমাত্র চঞ্চল করতে পারে নি। বরং সুজাতা এখন মাটির মতোই স্থির। গলায় তার স্বাস্থ্য বইয়ের বাংলা। গ্যারেজের চাবি নিয়ে বেরোতে বেরোতে রবি বলল, একটু বেরোচ্ছি—

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ফিরে তাকিয়ে দেখলো, সুজাতা তার কথা শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই। ফুলস্পীডে বুবু আর টুনির পড়ার ঘরে ঢুকছে। পৃথিবীটা যে ওর এত আপন—না দেখলে কারও বিশ্বাস হবে না। ধর্ম কি ধর্মহীনতা—কে যে সুজাতাকে এতখানি স্থিতধী করে তুলেছে—তা সঠিক করে বলা কঠিন।

পার্কস্ট্রীট ডাকঘরের সামনে তপতীদের ক্রিমসেল রঙের গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। তার ঠিক পেছনে পার্ক করে রবি বেরিয়ে এলো। রাত ন'টা

সওয়া ন'টা হবে। রাস্তাটা ফাঁকা ফাঁকা। সামনেই মাল্টিস্টোরিডের সিক্সথ ফ্লোরে বাঁ হাতের অ্যাপার্টমেণ্টে আলো জ্বলছে। বিনয় এসে যায় নি তো।

তপতী বেরিয়ে আসতেই বলল, তোমার গাড়ি বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। দরকার হলে সুবিনয়বাবুকে ডেকে আনতে পারবো।

কি ব্যাপার? গাড়ি থাক না।

না। দরকার নেই। আমায় বিশ্বাস করতে পারো তপতী। এখুনি তোমার একজন খুব চেনা লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হবে। 'রবি বলছিল— আর তপতীদের গাড়িটা বেরিয়ে গেল।

কে রবি? আমি এই অবস্থায় কারো সঙ্গে দেখা করতে পাববো না। আগে তো এক মহিলার সঙ্গে তোমার আলাপ করাই। তারপব তিনি এলে তার সঙ্গে কথা বলবে।

মহিলা? কে সে? তিনিই বা কে? আমার চেনা তিনি?

ভীষণ চেনা। জন্ম থেকে—

কি বলছো রবি। আমি কিছুই বুঝতে পাবছি না।

তুমি বলছিলে তোমাকে বাঁচাতে! আজ তুমি আর আমি আরেকজনকে বাঁচাবো।

আমি? কাকে বাঁচাবো রবি? কোনো নতুন বিপদে আমি পড়তে রাজী নই। এসেই ভুল করেছি। গাড়িটাও ছেড়ে দিলাম—

ইস্। এত ভয় আমাকে? আমি কি খুব খারাপ লোক তপু? এসেই যখন পড়েছো—ছ্যাখো না কি হয়।

আমার শরীর কিন্তু ভালো নেই একটু।

সুজাতা তোমায় সাবধানে থাকতে বলেছে। এই বাড়িটা দেখছো। মুখ তুলে ছ্যাখো। সাত তলায় বাঁ দিকের ঘরে আলো জ্বলছে —

হ্যাঁ। কিন্তু আমি কি করব?

লিফটে উঠে যাবে। কিন্তু সোজা যাবে না। সেভেনথ্ কিংবা এইটথ্

ফ্লোরে উঠে যাবে সোজা। তারপর সোজা নেমে আসবে সিঁড়ি দিয়ে। সিক্সথ্-এ। জাস্ট ওয়াক্ ডাউন।

কি বাজে বকছো। আমি অজানা জায়গায় উঠবো। নামবো। এই রাতে। শরীরের এই অবস্থায় ?

কোনো ভয় নেই তপু। আমি সিক্সথ্ ফ্লোরের 'এইচ্' ফ্ল্যাটের দরজায় থাকবো। তোমার ভীষণ চেনালোকের সঙ্গে আজ তোমার দেখা হবে। দেখা হওয়া দরকার। অন্তত একজন মহিলার জীবনের জন্যে।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না রবি।

দরকাব নেই বোঝার। তুমি চলো না। এক সঙ্গে দ'জন লিফ্‌টে উঠবো। আমি নেমে যাবো সিক্সথে। তুমি সেভেন্থ্ কিংবা এইট্‌থে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলে আমায় সিক্সথে পাবে।

এত লুকোচুরি কিসের ?

কারণ আছে তপু। লিফট্‌ম্যানের চোখ এড়িয়ে তোমায় সিঁড়ি দিয়ে সিক্সথ্ ফ্লোরে নেমে আসতে হবে।

বলছো যাচ্ছি। কিন্তু আমার ভয় করছে।

কোনো ভয় নেই। ভাগ্য ভালো হলে তোমার চেনা লোকের সঙ্গে এখুনি দেখা হয়ে যেতে পারে। নয়তো খানিক বাদেই দেখা হয়ে যাবে। সে হয়তো এখনো এসে পৌঁছয় নি। এলে সারা ফ্ল্যাটে আলো জ্বলতো। চলো যাই।

আমার চেনা ? কে সে ?

দেখলেই চিনতে পারবে। ভীষণ চেনা।

কথামতো সিঁড়ি বেয়ে তপতী সিক্সথে নেমে এলো লিফট্‌ম্যানের চোখ এড়িয়ে। আগেই নেমে গিয়ে রবি সিক্সথ্ ফ্লোরের 'এইচ্' ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়েছিল। এখানে আসায় তার জন্যে বিনয়ের এখন অবধি কোনো বারণ নেই।

তপতীর সবই অবাক্ লাগছিল। ভয়ও করছিল। রবি বলল দোর

খুললে আমি আগে ভেতরে যাবো। একটু বাদে তুমি। আচমকা তোমায় দেখে মহিলা ভয় পেয়ে যেতে পাবেন।
কে মহিলা ?
এখুনি আলাপ হবে তোমাব সঙ্গে।
বেল টিপতেই আলগোছে দরজা একটু খুললো। সঙ্গে সঙ্গে রবি ভেতরে চলে এলো। কলারওয়ালা গলাবন্ধ ব্লাউজ পরেছে কুন্দ। রবিকে দেখে যেন মাটি পেল। এসেছো? ভালো হল। টাকাগুলো নিয়ে যাও। আমাব কোনো কাজেই লাগবে না।
রাখো না। লেগে যেতে পারে।
আমাকে আজ কেউ বাঁচাতে পারবে না। প্রশান্ত যে কোথায় থাকে, তাও জানি না। ও যদি আজ আসতো।
বিনয়বাবু কখন আসবেন ?
যে কোনো সময় এসে পড়বে। ওর কথার কখনো নড়চড় হয় না।
বেল বেজে উঠতেই কুন্দ চমকে উঠলো। রবি বলল, ভয় নেই। বিনয়বাবু আসেন নি।
হ্যাঁ। তোমাদের বিনয়বাবুই এসেছে।
আমি বলছি আসে নি কুন্দ। তুমি ভেতরে যাও। আমি দোব খুলছি।
সাবধানে খুলো। আজ যে কী মূর্তিতে থাকবেন জানি না। আমাদের জন্যে পুরুষ লোকের খুনখারাপিরও পরোয়া করে না! আমরা এমনই জিনিস রবি!
আমায় দেখলে সে সব কিছু করবে না বিনয়বাবু।
ম্লান হাসিটুকু মুছে গেল কুন্দর মুখ থেকে। সে পাশের ঘরে চলে গেল।
রবি দোর খুলতে অবাক্ হয়ে ভেতরে ঢুকলো তপতী। কার ফ্ল্যাট ? লোকজন নেই ?
এখুনি আলাপ হবে সবার সঙ্গে। তোমার খুবই চেনা লোকের ফ্ল্যাট।

সেই থেকে বাজে বকছো। চলো। বাড়ি ফিরবো। সুবিনয় ফিরে এসে চিন্তা করছে হয়তো।

না। কববে না। ড্রাইভাব গিয়ে তো বলবে।

তোমার মতলবটা কি রবি?

ববি গলা তুলে বলল, কুন্দ। একবার বাইবে এসে সামনের দবজাটা আটকে দাও। ভয় নেই। সে আসে নি এখনো। তোমাব গান শুনতে আবেকজন লোক এসেছেন। বেবিয়ে এসে ছাখো।

এবাব তিন জনেবই তিন রকমেব অবাক্ হওয়াব পালা। কেউ আগাম তা জানতো না।

কুন্দ ঘবে ঢুকে দোব আটকাতে গিয়ে দেখলো, কার্পেটের ওপর একজন অপরিচিত মহিলা দাঁড়িয়ে। তাব দিকে পেছন ফিরে ঘবের আসবাব দেখছেন। ববি নিচু মোড়ায় একা বসে। ছিটকিনি তুলে দিয়ে কুন্দ ঘবেব মাঝখানটায় ফিবে আসছিল।

এসো। তোমাদেব আলাপ কবিয়ে দিচ্ছি।

তপতী ঘুবে তাকাতেই কুন্দ চমকে উঠলো। তপতীও। আব ওদের এ বকম দেখে ববিও।

কুন্দ এগিয়ে এলো তপতীর দিকে। আপনাকে চেনা চেনা—

তপতীও এগিয়ে এসেছে। আপনি? তুমি? আমার ভুল হচ্ছে না তো? তুমি ছোটমাসী—

তপু-উ—। প্রায় ছুটে গিয়ে কুন্দ জড়িয়ে ধরলো তপতীকে।

তপতী পড়ে যাচ্ছিল। তুই বেঁচে আছিস ছোটমাসী?

রবি চমকে উঠে দাঁড়িয়েছে। এমন তো সেও ভাবে নি।

কুন্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। মাথা নিচু করে আস্তে বলল, তুই আসবি জানলে মরে যেতাম। মরে যাওয়াই ভালো ছিল।

ববি শুধু বলতে পারলো, তুমি? তুমিই ওদেব হারানো ছোটমাসী? এমনও ঘটে!

এই প্রথম কুন্দর রবির দিকে তাকাতে ঘেন্না হল। লজ্জাও তাকে নিজের ভেতরে সেঁধিয়ে দিচ্ছিল। তবু চোখ খুলে তাকালো। পরিষ্কার বলল, এ তুমি কি করলে রবি ?

বিশ্বাস কর। আমি জানতাম না। বিলিভ মী।

তবে ওকে এখানে এনেছো কেন ?

সে তপতী নিজেই দেখবে। তোমরা দু'জনে যে মাসী-বোনঝি—তা আমি জানবো কি করে ?

না রবি। তপতী দেখবে না। তপু। তুই এখুনি চলে যা—

তপতীর সবই গোলমাল হয়ে গেছে। রাত ন'টার পর এমন অজানা জায়গায় দশ বছর আগে হারানো ছোটমাসী। তাও রবির সঙ্গে এসে দেখা হল। দু'জন দু'জনকে তুমি তুমি করছে। রবি যে কত বড় শয়তান! —আজ না এলে তার জানাই হোত না।

তপতীর মুখের ভেতরটা বালি বোঝাই হয়ে যাচ্ছে মনে হল। কে যেন তার শ্বাসনালীতে লোহার রড ঠেসে বালি গাদাচ্ছে। এখুনি তার চোখ দিয়ে বালি বেরিয়ে আসবে। মণির চারদিক থেকে।

আরেকটু হলে পড়ে যেত তপতী। দেওয়াল ধরে উঁচু টানা গদিতে গিয়ে বসলো। তারপর ভীষণ ঢিমে গলা বেরিয়ে এলো তার।- তুই বেঁচে আছিস ছোটমাসী! বাবা আর প্রশান্ত মেসো আজ দশ বছর তোর খোঁজে ময়ূরভঞ্জ, বীরগঞ্জ করে বেড়াচ্ছে। অথচ তুই কলকাতায়! এত কাছে আছিস ? আমি কিছু বুঝতে পারছি নে—

রবি বলল, তোমার বাবা ওকে খুঁজছেন ? ময়ূরভঞ্জে ? এখানে ? হো হো করে হেসে উঠলো রবি।

রাগে উঠে দাঁড়ালো তপতী। লোফারদের মতো হাসবে না। গত মাসেও বাবা রম্ভার কাছাকাছি কোন্ হেলথ্ সেন্টারে ছোটমাসীর মতো দেখতে এক স্টাফ নার্সের খবর এনেছিল।

হেলথ্ সেন্টার! তোমার বাবা !! আরও জোরে হেসে উঠলো রবি।

রাগে তপতী ছোটমাসীর দিকে তাকালো।

ছোটমাসীর মাথাটা তখন তার নিজেরই কাঁধের ওপর প্রায় ঢলে পড়েছে। চোখ মাটিতে। বেয়াড়া চোখের জলে নাক মুখ ডুবড়ে যাচ্ছিল ওর।

কোনো সায় না পেয়ে এই শরীরেও তপতী তেতে উঠলো। রবির সঙ্গে কি সম্পর্ক কে জানে। রবি সব পারে। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে হাসতে হাসতে। ছোটমাসীর দিকে তাকিয়ে তার ঘেন্না এলো। গলা দিয়ে ধরা কয়লা বেরিয়ে আসতে লাগলো তার। কেন যে এখানে তুমি দশ বছব ধরে নাম ভাঁড়িয়ে কুন্দ সেজে বসে আছো জানি না।

রবি মাঝখানে বাধা দিয়ে উঠলো। হাসতে হাসতেই। বেশ হাসিচ্ছলে।

—তা একটু বাদেই জানতে পারবে। অস্থির হবার কিছু নেই—

আমি একটা কথাও মিথ্যে বলি নি। প্রশান্ত মেসো রস্তা থেকে ফিরে কী রকম ভেঙে পড়েছেন যদি দেখতে—

এই প্রথম কুন্দ মুখ তুললো, তাই বুঝি—

রবি, তপতী—দু'জনেই দেখলো— জলে ওর দু'টো চোখই ঝাপসা হয়ে এসেছে।

রবি বলল, আমি বলি কি—তোমরা দু'জনই একটু বোসো।

তপতী ছুটে দরজার দিকে যাচ্ছিল। না। আমি এখুনি চলে যাবো। বলেই ছোটমাসীর দিকে তাকালো। তোর মরে যাওয়াই ভালো ছিল ছোটমাসী! এ মুখ কেউ দেখায়!

কুন্দ আবার মুখ তুলে তাকালো।—তুই তাই বললি—

তপতী 'হ্যাঁ' কথাটাও না বলে বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। রবি আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। ঠিক তখন।

তখনই ঠিক।

লম্বা করে বেল বেজে উঠলো। কুন্দ বুঝলো, কার বেল। কার হাতের অস্থির বুড়ো আঙুল জোরে বোতাম চেপে ধরেছে—সে পরিষ্কার বুঝতে

পারলো। তাই আরও চমকালো। সে জোরে রবিকে বলে উঠলো, তপুকে ও ঘরে নিয়ে যাও। ওকে নিয়ে যাও রবি।

রবি এই প্রথম জোর দিয়ে বলল, না। নিয়ে যাবো না। ও দরজা তপুই খুলে দেবে। তুমি সরে এসো কুন্দ। ঘরের মালিক এসেছেন! যাও তপু দরজা খোল।

এতক্ষণের ভেতর এবার কুন্দ কথা বলতে গিয়ে গলা চিরে ফেললো। করছো কি রবি। তপুকে ও ঘরে নিয়ে যাও। আমি যে মাথা তুলতে পারবো না ওর সামনে।

তপতী চলেই যাচ্ছিল। নিজে, দরজা খুলে। কিন্তু রবিকে দিয়ে তাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ছোটমাসীর কথায় সে মেঝেব ওপব বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। তাবপর রবি যখন বলল, না। ও দবজা তপুই খুলে দেবে —তখন, সব গোলমাল হয়ে গিয়ে সে ছিন্ন মানুষেব মতো এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইলো।

এবারের বেল আরও লম্বা করে বাজতে থাকলো।

রবি আস্তে তপতীর কাছে গিয়ে বলল, কোনো ভয় নেই। তুমি দরজা খুলে দাও। আমি আছি তোমাব পাশে। তোমারই এ দরজা খোলা দরকার।

তপু কিছু বুঝতে না পেরে ক' পা এগিয়ে একেবাবে আন্দাজে ছিটকিনি নামিয়ে দিল।